দাম : পাঁচ টাকা

স্বস্তিকা

২৮ নভেম্বর - ২০১১, ১১ অগ্রহায়ণ - ১৪১৮

৬৪ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা

মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমে সংস্কৃত কি এখনও অবহেলিত হবে?

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ❑ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ❑ ৬-৭

২০১৪ লোকসভা নির্বাচন : কংগ্রেসের পাপের ফল ভুগবে ইউ পি এ শরিকরাও ❑ ৮

কংগ্রেস-তৃণমূল জোট কি ভাঙতে চলেছে? ❑ ৯

কালো টাকা কংগ্রেসকে কালো করেছে ❑ অমলেশ মিশ্র ❑ ১১

স্টিভ জোবস : বিজ্ঞানী হয়েও তপস্বী ❑ ডঃ জয় দুবাসী ❑ ১৩

মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমে সংস্কৃত কি এখনও অবহেলিত হবে? ❑ নবকুমার ভট্টাচার্য ❑ ১৫

সংস্কৃত— দেবতা ও মানুষের কথোপকথনের ভাষা ❑ শ্রীশ দেওপূজারী ❑ ১৬

'মৃতভাষা'রা সত্যিই কি মৃত? ❑ ডি এন বেজবরুয়া ❑ ১৮

অপশাসন থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিল্লীর কুর্সির লক্ষ্যে রাজ্যভাগের কৌশল মায়াবতীর ❑ ২০

খোলা চিঠি : দিদির মন্ত্রিসভায় 'আমরা-ওরা' বিভাজন ❑ সুন্দর মৌলিক ❑ ২১

হিন্দু অর্থনীতি ❑ নীতিন রায় ❑ ২৩

ভারতীয় সাংস্কৃতিক সংহতিতে আধ্যাত্মিক জীবনের অবদান ❑ স্বামী দেবনারায়ণপুরীজী মহারাজ ❑ ২৪

একদিন দার্জিলিঙে ❑ হিতেন্দ্র কুমার ঘোষ ❑ ২৬

শান্তির প্রতীক তিন অসামান্যা ❑ ইন্দিরা রায় ❑ ২৭

ভারত-পাক সম্পর্কে কণ্ডোলিজার বক্তব্য নিয়ে উন্মাদনা নিরর্থক ❑ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ ২৮

থানায় হানা : কুকুরকে লাই দিয়ে মাথায় তোলা হয়েছে ❑ শিবাজী গুপ্ত ❑ ৩০

'স্মোকিন জো' ছিলেন পুরুষকারের আদর্শ প্রতিভূ ❑ জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

এইসময় : ১০ ❑ **অন্যরকম : ১৯** ❑ **চিঠিপত্র : ২২** ❑
সমাবেশ-সমাচার : ২৯ ❑ **শব্দরূপ : ৩২** ❑ **চিত্রকথা : ৩৩**

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

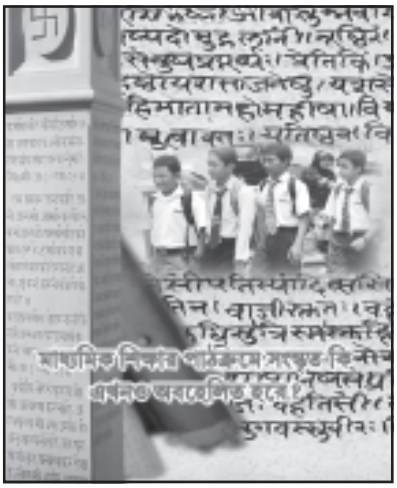

সংস্কৃত কি এখনও অবহেলিত হবে? — পৃঃ ১৫-১৮

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য
সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৪ বর্ষ ১৩ সংখ্যা, ১১ অগ্রহায়ণ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ
যুগাব্দ - ৫১১৩, ২৮ নভেম্বর - ২০১১

দাম : ৫ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.- Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

সম্পাদকীয়

ইন্দো-চীনি ভাই-ভাইয়ের অশনি সংকেত

পূর্বে একবার ইন্দো-চীনি ভাই-ভাই করিয়া ভারত চরম শিক্ষা পাইয়াছে। তবুও পুনরায় ইন্দো-চীনি ভাই-ভাইয়ের সুর ধরা পড়িল আশিয়ান সম্মেলনে। গত বছরের শেষে দিল্লি সফরে আসিয়াছিলেন চীনের প্রধানমন্ত্রী। মনমোহন-জিয়াবাও সেই আলোচনাতেই স্থির হইয়াছিল দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ আরও বাড়াইতে হইবে। পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে নয়াদিল্লির যে বিপুল ঘাটতি তাহাও কমাইয়া আনিবার ব্যাপারে নজর দিবে চীন। এক বছর পরে দেখা যাইতেছে ভারতের বাজার চীন দখল করিলেও, নয়াদিল্লির বিপুল ঘাটতির প্রতি চীন নজর দেয় নাই। উল্টে ভারতের ভূমির প্রতি চীনের লোভ দিন দিন বাড়িয়াই চলিতেছে। সাম্প্রতিককালে লাদাখে এবং উত্তরাখণ্ডে একাধিকবার চীনা সৈন্যদের ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশের ঘটনা ঘটিয়াছে। লাদাখে ভারতীয় ভূখণ্ডের দু'কিমি ভেতরে হেলিকপ্টার লইয়াও ঢুকিয়া পড়িয়াছিল চীন। তাই ভারত-চীন সীমান্তে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত লইতে বাধ্য হইয়াছে ভারত। সীমান্তে ভারতের সেনা বৃদ্ধির সিদ্ধান্তে হুঁশিয়ারি দিতেছে চীন। ভারতের মানচিত্র বিকৃতরূপে প্রকাশ করা হইতেছে চীনের পক্ষ হইতে। এই বিকৃত মানচিত্র লইয়া প্রশ্ন করিলে 'শাটআপ' বলিয়া ভারতীয় সাংবাদিককে হুমকিও দিতেছেন নয়াদিল্লীর চীনা রাষ্ট্রদূত এইচ ই ঝাং ইয়ান। ভারতীয় সামরিক ঘাঁটিগুলির উপর সবসময় নজর রাখিতেছে চীন। পশ্চিমবঙ্গেও দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি জেলার বেশ কয়েকটি বৌদ্ধমঠ চীনের নিয়ন্ত্রণে ভারতীয় সামরিক ঘাঁটির কাছাকাছি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তৈরি হইয়াছে। বস্তুত, চীন ভারতকে চতুর্দিক দিয়া ঘিরিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয় চীনের এক কূটনৈতিক চাল ব্যতীত আর কিছুই নহে। অত্যন্ত সুচতুর ও ধড়িবাজ রাজনীতিতে বিশ্বাসী চীনারা ভারতকে বন্ধুত্বে ভুলাইয়া কার্যসাধন করিতেই আগ্রহী। ইন্দো-ভিয়েতনাম চুক্তির ফলে দক্ষিণ চীন সাগরে তৈল অনুসন্ধানের বরাত পাইয়াছে ও এন জি সি। কিন্তু দক্ষিণ চীন সাগরে ভারতীয় সংস্থাকে অনুসন্ধান করিতে দিতে আপত্তি রহিয়াছে চীনের। ভারতীয় সীমান্তে সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্তও ভাল চোখে দেখিতেছে না চীন।

চীনের সঙ্গে ভারতের 'সুসম্পর্কে'র (নাকি কু?) ইতিহাস বহুকালের এবং তাহারই সূত্র ধরিয়া এই ভাই-ভাই সম্পর্কের উদ্যোগ। কিন্তু এহেন ভ্রাতৃত্বের বন্ধন কতটা স্থায়ী হইবে তাহা চীনের উপরেই নির্ভর করিবে। কারণ পূর্বেও হিন্দি-চীনি ভ্রাতৃত্বের স্বপ্ন ভাঙিয়া চীন ভারত আক্রমণ করিয়াছে। আজ চীন আমাদের অর্থনীতি ভাঙিয়া দিতে উদ্যত। দেশের বাজারে চীনের নিম্নমানের বস্তু আসিয়া আমাদের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে ধ্বংস করিয়া দিতেছে। শিশুদের খেলনা বলিয়া চীন যাহা এরাজ্যে বিক্রয় করিতেছে তাহা শিশুদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক বলিয়া স্বাস্থ্য বিভাগের অভিমত। ইহার পর দেশকে ভাগ করিবার প্রয়াস করিতেছে চীন। বহুপূর্ব হইতেই চীন তাহার অপরিণামদর্শী রাজনৈতিক মতবাদের বিভ্রান্তি তাহাদের কিছু এদেশীয় এজেন্টের মাধ্যমে দেশের জনসাধারণের একাংশের মধ্যে ছড়াইয়া দেশের আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটাইয়াছে। বস্তুত মাওবাদী আক্রান্ত ভারতবর্ষের এই অবস্থার জন্য চীনের অবদানও কম নহে। তাই হিন্দি-চীনি ভাই-ভাই করিয়া চীনকে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করিলেও তাহা মারাত্মক ভুল হইবে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

হৃদয়কে জয় করা, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়কে মিশিয়ে দেওয়া, ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হওয়া, একেই বলে সংগঠন। যদি আমরা আরও বেশি অধ্যয়ন করি, তাহলে বুঝতে পারবো যে, রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যক্তিকে বিলীন করে দেওয়ার মধ্যেই রাষ্ট্রের কল্যাণ নিহিত। ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বই আমাদের সকল দুঃখ-কষ্ট এবং অসুবিধার মূল কারণ। ব্যক্তিদের বিনাশের অর্থ মৃত্যু নয়, উন্নতি লাভ। তখন আর আমরা ব্যক্তি থাকি না, রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হই। যদি সমগ্র রাষ্ট্রের সঙ্গে আমরা আনন্দিত বা দুঃখিত হই, তাহলে আমাদের কত বিরাট উন্নতি ঘটিবে!

—মাধবরাও সদাশিবরাও গোলওয়ালকর (শ্রী গুরুজী)

তিব্বতী গিরিপথ দখলের লক্ষ্যে ‘রিহার্সাল’ চীনের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত এক বছরে তিব্বতে ৫টি সামরিক অভিযান চালানোর পর চীন এই প্রথমবারের জন্য সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া গাড়ি এবং বায়ুসেনার মাধ্যমে ৫০০০ মিটারেরও বেশি উঁচু তিব্বতী গিরিপথ দখলের জন্য ‘রিহার্সাল’ দিল। চীনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রে দাবি করা হয়েছে, ‘‘সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এত বেশি উচ্চতায় হিমশীতল পরিবেশে এই প্রথম পিপল লিবারেশন আর্মির বায়ুসেনা এবং স্থলবাহিনীর জওয়ানেরা যৌথভাবে সামরিক কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করলেন।’’

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, গিরিপথ দখলের লক্ষ্যেই সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চ-উচ্চতায় মালভূমি এলাকার পশ্চিমাংশে যৌথসেনাবাহিনী-কে নিয়ে এসে বসাচ্ছে চীন। যা অবশ্যই সেনা-কৌশলের দিক দিয়ে অপরাধজনক ও বে-আইনি। চীনা সেনাবাহিনীর এই যৌথ কুচকাওয়াজে অংশ নিয়েছে, চীনের বায়ুসেনা, স্থলবাহিনী, সাঁজোয়াবাহিনী, এমনকী রাসায়নিক প্রতিরক্ষা গোষ্ঠী (কেমিক্যাল ডিফেন্স গ্রুপ) পর্যন্ত। সামরিক বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন, চীন তার এই সামরিক অনুশীলনে জে-১১ এবং জে-১০ এয়ারক্র্যাফটের সাহায্য নিতে পারে।

এব্যাপারে চীনা রিপোর্ট হলো, ‘‘কুচকাওয়াজের একেবারে প্রথম থেকেই শত্রুকে নিখুঁত লক্ষ্যে বিদ্ধ করতে বিভিন্ন নতুন অস্ত্র-পদ্ধতির সহায়তায় নতুন ধরনের যুদ্ধ-পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে পিপল লিবারেশন আর্মির বায়ুসেনার তরফে। ‘কম্যান্ডিং পয়েন্ট’গুলি বন্ধ করে দেওয়ার অব্যবহিত পরেই পুরোদস্তুর গুলি নিক্ষেপের জন্য ‘লং-রেঞ্জ’ পিস্তল তাক করা হয়েছে শত্রুপক্ষের গোলন্দাজবাহিনী এবং কম্যান্ডিং পোস্টের দিকে।’’

সংবাদসংস্থা সূত্রের খবর, এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সাজোঁয়াবাহিনীর গাড়িগুলি এবং পদাতিকবাহিনীর যুদ্ধ-যানগুলি নতুন করে সুবিন্যস্ত করার পর এবং শত্রুপক্ষের দখলে থাকা গিরিপথগুলির ওপর অতর্কিত এবং সশস্ত্র হানা সংঘটিত করার পরেই। শত্রুপক্ষের পথ বন্ধ করতে এবং তাদের কম্যান্ড পোস্টে হানাদারি চালাতে বিশেষ অভিযান হয়েছে চীনা সেনাবাহিনী’র তরফে বলে জানা গিয়েছে। ওই রিপোর্টেই জানা যাচ্ছে চীনা সেনাবাহিনীর বায়ুসেনার জওয়ানরা অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট মিসাইলের সাহায্যে এই অপারেশন চালায়।

একইসঙ্গে, পিপল লিবারেশন আর্মির প্রতিবেদনে দাবী করা হয়েছে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫০০০ মিটারের উঁচু গিরিপথে পৌঁছোনোর পর সাজোঁয়া বাহিনী’র গাড়িগুলি এবং পদাতিক বাহিনী’র যুদ্ধযানগুলি ‘‘উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত শত্রুপক্ষের ‘সমাজচ্যুতির প্রতিবন্ধকতা’ ভেঙে পাহাড়ের গভীরে প্রবেশ করেছে।’’

জানা যাচ্ছে ঠিক অনুরূপ প্রচেষ্টায় ৫০০০ মিটারের উঁচু আরেকটি গিরিপথ, যা বেশ কয়েক শো কিলোমিটার দূরবর্তী’ স্থানে অবস্থিত তাও পিপল লিবারেশন আর্মি দখল করে নিয়েছে, চীনা এয়ারফোর্সের পরিকল্পনায় এবং এয়ারফোর্সের জওয়ানরা সেই লক্ষ্যকে মসৃণ করে দেবার পর। রিপোর্টে এও বলা হয়েছে, ‘‘৪৫০০ মিটারেরও বেশি উচ্চতায় মালভূমিতে সামরিক অভিযান চালানো মানে মানুষের স্বাস্থ্য এবং অস্ত্র-শস্ত্র প্রতিযোগিতাকে অন্তিম চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দেওয়া। স্থল-আকাশপথে যৌথ কুচকাওয়াজকে সাফল্যের মুখ দেখাতে চীনের রাসায়নিক প্রতিরক্ষা সহায়তা গোষ্ঠী, কারিগরী সহায়তা গোষ্ঠী, সৈন্য সরবরাহ সহায়তা গোষ্ঠী, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সহায়তা গোষ্ঠী এবং রণক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসাদানকারী সহায়তা গোষ্ঠীর সংশ্লিষ্ট কার্যকারিতা রয়েছে এর পেছনে।’’

সংস্কৃতভারতীর ভাষাবোধন বর্গ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আদ্যামায়ের পুণ্য পীঠস্থানের বালকাশ্রমে ‘সংস্কৃত ভারতী দক্ষিণবঙ্গের প্রথম কার্যকর্তা বৈঠক তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হলো। দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সংস্কৃত ভারতীর অখিল ভারতীর সংগঠন সম্পাদক দিনেশ কামত পূর্ণ সময় উপস্থিত থেকে কার্যকর্তাদের পথনির্দেশ করেন। কার্যকর্তাদের সংস্কৃত ভাষায় শুদ্ধভাবে কথা বলার জন্য ভাষা বোধন বর্গেরও আয়োজন করা হয়। গত ২০ নভেম্বর বিকাল দু’টোয় অনুষ্ঠিত হলো সংস্কৃত অনুরাগী সম্মেলন। প্রধান বক্তা ছিলেন দিনেশ কামত ও সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আদ্যাপীঠ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সম্পাদক ও ট্রাস্টি মুরাল ভাই। সংস্কৃত ভারতী কলকাতা শাখা দ্বারা প্রকাশিত প্রথম সংস্কৃত সঙ্গীতাঞ্জলি পুস্তকের বিমোচন করেন মুরাল ভাই। বিদ্যালয়ে সংস্কৃত আবশ্যিক করার দাবি জানানো হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে। অনুষ্ঠান শেষে সকলকে ধন্যবাদ জানান সংস্কৃত ভারতীর রাজ্য-কার্যকর্তা পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য।

বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে (ডান দিক থেকে) মুরালভাই, দীনেশ কামত ও প্রণব নন্দ। — ছবি : শিবু ঘোষ

আফস্পা উঠিয়ে কাশ্মীরকে নিরস্ত্রীকরণের জঙ্গি-ছক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ জম্মু-কাশ্মীর সরকারের চাপের কাছে নতিস্বীকার করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক যেভাবে জম্মু-কাশ্মীর থেকে আফস্পা (আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ারস' অ্যাক্ট বা এ এফ এস পি এ) প্রত্যাহার করে নিতে চাইছে, তা ভালো চোখে দেখছেন না ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রাক্তন আধিকারিকরা। সরাসরি সরকারের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী'র যে কোনও মন্তব্যই এদেশের সংবিধান বিরোধী বলে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য না করলেও ঘনিষ্ঠ মহলে তাঁদের ক্ষোভ ব্যক্ত করতে ছাড়ছেন না সেনা-জওয়ানরাও। অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল ডঃ জি ডি বক্সী যেমন 'টাইমস অব্ ইন্ডিয়া'য় লেখা এক প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন— ''বিদেশী অর্থ-পুষ্ট এন জি ও-গুলি সেনাবাহিনীকে পিশাচে পরিণত করেছে এবং সেনাবাহিনীর জেহাদ বিরোধী ও সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী অভিযানকে ব্যাহত করছে।'' বর্তমান সেনা-কর্তারাও ঘনিষ্ঠমহলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে সুপরিকল্পিতভাবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙে দিতে তার 'অত্যাচারে'র বিবরণ ফুলিয়ে- ফাঁপিয়ে বাজারে ছড়িয়ে 'একঘরে' করে দেবার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। সেইসঙ্গে গোটা কাশ্মীর থেকেই আফস্পা আইন প্রত্যাহার করে সন্ত্রাসকবলিত রাজ্যটিকে নিরস্ত্রীকরণ করে সন্ত্রাসের মুক্তাঞ্চলে পরিণত করার ব্যবস্থা হচ্ছে বলে মনে করছেন অনেক পুরোনো সেনা-কর্তাই। প্রসঙ্গত, ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে আফস্পা চালু হয়ে গিয়েছিল জম্মু-কাশ্মীরে। অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় বাদে দেশে বিভিন্ন সমস্যা-জর্জরিত পরিস্থিতি'র মধ্যে যেভাবে আফস্পা প্রত্যাহার নিয়ে টানাপোড়েন চলছে, তাতে অশনি-সংকেতের ছায়া দেখছেন অনেকেই। বিশেষ করে গত দু'দশকে জম্মু-কাশ্মীরে পট পরিবর্তন হয়েছে অনেকটাই। ১৯৯০ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত ৮০ হাজার এ কে সিরিজের রাইফেল, ১৩ শো মেশিনগান, ২ হাজারের ওপর রকেট লঞ্চার, ৬৩ হাজার হ্যান্ড গ্রেনেড এবং ৭০ লক্ষ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী। বোঝাই যায়, জঙ্গিরা গত কুড়ি বছরে কী পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র আমদানি করেছিল ভারতীয় ভূ-স্বর্গে। তবে এই পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্রকে আপাতত হিমশৈলের চূড়া বলেই মনে করছে সেনাবাহিনী। ওই দু'দশকে ঝিলম নদী দিয়ে বহু জল বয়ে গিয়েছে। কার্গিল হয়েছে, বার বার সেনাবাহিনী'র ওপর পাথর-ছোঁড়ার ঘটনা ঘটেছে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সেনাবাহিনী'র অত্যাচারের গল্প ফেঁদে তা বিদেশে বাজারজাত করা হয়েছে। গঙ্গা-যমুনা দিয়েও কম জল বয়ে যায়নি। সংসদে হামলা থেকে ২৬।১১, সন্ত্রাসবাদীদের দৌরাত্ম্য ভারতের রাজধানী (পড়ুন দিল্লী) থেকে বাণিজ্যিক রাজধানী (পড়ুন মুম্বাই) ভায়া সাংস্কৃতিক রাজধানী (পড়ুন কলকাতা) হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। গত দু'দশকের যাবতীয় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করে সেনাবাহিনী'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একাংশের ধারণা— ভারতের সর্বত্র অবাধে যেভাবে একের পর এক সন্ত্রাসবাদী হামলা চালিয়েছে জঙ্গিরা, সেই পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবেই জম্মু-কাশ্মীরকেও নিরস্ত্রীকরণ করে সেখানেও অবাধে লুঠতরাজ তথা জম্মু- কাশ্মীরকেই ভারতের হাতের বাইরে নিয়ে যেতে ইসলামী মৌলবাদীরা কিছু এদেশীয় পাক-এজেন্টকে ব্যবহার করছে।

দিল্লীতে বিজেপির জনচেতনা রথযাত্রার সমাপ্তি

কেন্দ্রে সরকার পরিবর্তনে 'যুদ্ধ' ঘোষণার ডাক

রামলীলা ময়দানে জনচেতনা রথযাত্রার অন্তিমদিনে লালকৃষ্ণ আদবানীর সঙ্গে সুধীন্দ্র কুলকার্ণী, ফাগন সিং কুলস্তে, মহাবীর ভাগোরা ও অন্যান্য বিজেপি নেতৃবৃন্দ।

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০ অক্টোবর দিল্লীর ভিড়ে ঠাসা রামলীলা ময়দানে বিজেপি-র শীর্ষ নেতা-নেত্রীদের এবং এন ডি এ-র শরিক দলগুলির প্রতিনিধিদের পাশে নিয়ে বিরোধী জোটের যে ঐক্যবদ্ধ রূপটি প্রদর্শিত হলো সেটাই লালকৃষ্ণ আদবানীর জনচেতনা রথযাত্রার সাফল্য বলে মনে করা হচ্ছে। এই সাফল্যকে সম্বল করেই বিজেপি এদিন কেন্দ্রে সরকার বদলের জন্য 'যুদ্ধ' ঘোষণা করল। এমনকী এনডিএ-র শরিক না হয়েও নিজের প্রতিনিধিকে পাঠিয়ে জয়ললিতা শক্ত করলেন তাঁদের হাত। বিজেপি সভাপতি নীতিন গড্‌কড়ীর লিখিত খসড়া পড়ে শ্রী আদবানী ঘোষণা করলেন, এনডিএ-র ২১৫ জন সাংসদ লোকসভার স্পীকার ও রাজ্যসভার চেয়ারম্যানকে জানাবেন, বিদেশি ব্যাঙ্কে তাঁদের কোনও অবৈধ সম্পত্তি নেই।

আটত্রিশ দিন ধরে তেইশটি রাজ্য, চারটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সাড়ে সাত হাজার কিলোমিটার ঘুরে গত ২০ নভেম্বর, দিল্লীর রামলীলা ময়দানে শ্রী আদবানীর দুর্নীতি-বিরোধী জনচেতনা রথযাত্রা শেষ হয়। গত ১১ অক্টোবর বিহারে জয়প্রকাশ নারায়ণের জন্মস্থান সিতাবদিয়ারা থেকে এই রথযাত্রার শুরু। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার পতাকা নাড়িয়ে এই যাত্রার সূচনা করেন।

শ্রী আদবানী বলেন, এত অপদার্থ সরকার আগে কখনও দেখা যায়নি। এই ইস্যুতে যে লাগাতার আন্দোলন চলবে তাও স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন তিনি। বিরোধী নেত্রী সুষমা স্বরাজ বলেন, আসন্ন সংসদের অধিবেশনে শুরু হবে তাঁদের লড়াই, সেখানে কংগ্রেসকে চারদিক থেকে আক্রমণ করা হবে। অধিবেশন শেষ হওয়ার পরে ফের রাস্তায় নেমে তাঁরা এই সরকারের অপসারণের দাবীতে আন্দোলন চালাবেন।

'ক্যাস ফর ভোট' (টাকার বিনিময়ে ভোট) কেলেঙ্কারিতে যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, সেই প্রাক্তন সাংসদ ফাগন সিং কুলস্তে, মহাবীর ভাগোরা ও সুধীন্দ্র কুলকার্ণীকে মঞ্চে উপস্থিত করা হলে জনতা হর্ষধ্বনিতে উত্তাল হয়ে উঠেন। এই তিনজনই টাকা দিয়ে ভোট কেনার কেলেঙ্কারিটি জনসমক্ষে ফাঁস করে দেন। অথচ সরকার চোরকে না ধরে তাঁদেরই গ্রেপ্তার করে। শ্রী আদবানী বলেছেন, এঁরা এই দোষে অভিযুক্ত হলে তিনিও সেই দোষে দোষী। লক্ষণীয়, সাম্প্রতিক অতীতে আন্না হাজারের সমর্থনে মানুষের যে সমাবেশ দেখা গিয়েছিল, ওইদিন ঐক্যবদ্ধ বিজেপি-র সভাতে তার চেয়ে অনেক বেশি জনসমাগম দেখা যায়।

২০১৪ লোকসভা নির্বাচন

কংগ্রেসের পাপের ফল ভুগবে ইউ পি এ শরিকরাও

গূঢ়পুরুষের
কলম

সারা দেশজুড়ে কংগ্রেসের এখন দেউলিয়া অবস্থা। দল জনসমর্থন হারিয়েছে। কারণ, দুর্নীতির ঘুণপোকা কংগ্রেসের সর্বস্তরে প্রবেশ করেছে। দেশের দায়িত্বে এমন একজন প্রধানমন্ত্রী আছেন যাঁর কথা দলের কেউই শোনেন না। দেশের সাধারণ মানুষও এই প্রধানমন্ত্রীর কথা বোঝেন না। কারণ, তিনি মাঝে মধ্যেই টেলিভিশনে বিড়বিড় করে কিছু বলেন দেখা যায়। কিন্তু তা শোনা বা বোঝা যায় না। কিন্তু এমন একজন ব্যক্তিত্বহীন ব্যক্তি ভারতের প্রধানমন্ত্রী! ভাবতেও খারাপ লাগে। তা'ছাড়া ভারতের মতো একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী লোকসভার নির্বাচিত সাংসদ নন। প্রধানমন্ত্রীর পদের মর্যাদার কথা মনে রাখলে মনমোহন সিংয়ের উচিত ছিল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জিতে সাংসদ হওয়া। পিছনের দরজা দিয়ে দলীয় নেত্রীর অনুগ্রহে অসম থেকে রাজ্যসভায় সাংসদ হওয়াটা প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদার বিরোধী। সম্ভবত এই কারণেই তিনি হীনমন্যতায় ভোগেন। মন্ত্রিসভার বৈঠকে তাঁকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা পাত্তা দেয় না। তবু তিনি প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসে আছেন। কেন বসে আছেন সেই কথাটা একমাত্র জানেন কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী। যে নেত্রীর প্রয়োজন একজন পুতুল প্রধানমন্ত্রী। নেত্রী অনুমতি দিলে তবেই কথা বলবেন। নেত্রীর পরামর্শ দিলে তবেই সিদ্ধান্ত নেবেন। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এমন প্রধানমন্ত্রীর দ্বিতীয় নজির নেই।

তবে একটা কথা কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের জেনে রাখা ভাল যে ভারতের 'আমজনতা' সোনিয়া গান্ধীর বশংবদ মনমোহন সিং নয়। হাতের পুতুলও নয়। দেশজুড়ে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, কংগ্রেসী নেতা-মন্ত্রীদের লাগামছাড়া আর্থিক দুর্নীতিতে মানুষের জীবন জেরবার হয়ে পড়েছে। সাম্প্রতিককালে সমস্ত নির্বাচনে ভোটদাতারা কংগ্রেস প্রার্থীদের জামানত জব্দ করে দিয়েছে। আগামী দিনেও উত্তরপ্রদেশ সহ যে সমস্ত রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন হতে চলেছে সেখানে কংগ্রেস যে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অথচ কংগ্রেস এমনভাবে জন সমর্থন হারাতো না যদি দলীয় নেতৃত্ব প্রশাসন থেকে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করতে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে লোকপাল বিল সংসদে পাশ করিয়ে কড়া আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হোত। যদি দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত বিপুল

অঙ্কের কালো টাকা (পড়ুন ডলার), সোনা ইত্যাদি বিদেশের ব্যাঙ্ক থেকে ফেরৎ এনে দেশের মানুষের উন্নয়নে ব্যবহার করার উদ্যোগ গ্রহণ করতো। মনমোহন সিং অথবা প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মতো পণ্ডিত অর্থনীতিবিদ না হয়েও 'আমজনতা' বোঝেন বিদেশে গচ্ছিত 'কালা ধন' উদ্ধার করলে বর্তমান মূল্যবৃদ্ধি পুরোপুরি রুখে দেওয়া যাবে। আগামী দশ বছর উন্নয়ন প্রকল্পের খাতে ব্যয়-বরাদ্দের জন্য জনগণের উপর করের বোঝা চাপাতে হবে না। বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয়ে ভারত এশিয়ায় এক নম্বর দেশ হবে। বিদেশে অবৈধভাবে গচ্ছিত রাখা সোনা উদ্ধার করলে টাকার দাম ও মর্যাদা যেভাবে বাড়বে তা আমাদের কল্পনার বাইরে। কিন্তু কংগ্রেস কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকলে 'কালা ধন' উদ্ধার করা যাবে না। এই পরম সত্যটি দেশের মানুষ বুঝেছেন। সবাই জেনেছেন যে দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতায় থাকার সুবাদে কংগ্রেসেরই স্নেহধন্য শিল্পপতি, মন্ত্রী, আমলারাই ভারতের সোনা, অর্থ বিদেশের ব্যাঙ্কে পাচার করেছে। তাই সমস্ত তথ্য জানা থাকলেও প্রণববাবুরা কু-যুক্তি দেখিয়ে কালো টাকার মালিকদের নাম প্রকাশ করতে চাইছেন না। প্রণববাবুরা জানেন, নামধাম প্রকাশিত হলে জনরোষে কংগ্রেস দল ভারতের মাটি থেকে চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

হিন্দু সনাতন ধর্মে 'সত্য' দীপ্তিমান সূর্যের মতো। প্রভাকরের দীপ্তিকে মেঘ দিয়ে চিরকালের জন্য আবৃত রাখা যায় না। ভাস্করের প্রভার মতোই 'সত্য' একদিন কংগ্রেসের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হবে। দেশের সাধারণ মানুষ সে কথাটা জানেন। তাই আজ ২০১১ সালের শেষভাগে দাঁড়িয়ে দ্বিধাহীনভাবে বলতে পারি যে ২০১৪ সালের লোকসভার নির্বাচনে কংগ্রেস কেন্দ্রে ক্ষমতায় ফিরবে না। শুধু কংগ্রেসই নয়, বর্তমান ইউপিএ জোটের শরিকরাও কংগ্রেসের পাপের ফল ভোগ করবে। যেমন, পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের শরিক দলেরা সিপিএমের পাপের ভাগ নিয়ে বাংলার মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সত্যটি জানেন বলেই এখন থেকে কংগ্রেসের থেকে দূরত্ব রাখতে চেষ্টা করছেন। তবে তাতে আখেরে লাভ নেই। কারণ, ইউ পি এ ছেড়ে এন ডি এ জোটে যোগ দেওয়াটা নেত্রীর পক্ষে সহজ হবে না। সর্বভারতীয় রাজনীতিতে মমতার বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। বিজেপি এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব তাঁকে বিশ্বাস করে না। ঘরে বাইরে বিপন্ন কংগ্রেসকে ব্ল্যাকমেল করে কিছুকাল তিনি সুবিধা আদায় করতে পারেন। বরাবর নয়। ব্ল্যাকমেলারকে কেউ পছন্দ করে না। এটাই সত্য। এটাই বাস্তব।

সংশোধনী

স্বস্তিকার গত ২১ নভেম্বর, ২০১১, ৪ঠা অগ্রহায়ণ - ১৪১৮, ৬৮ বর্ষ, ১২তম সংখ্যার ৮ম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে প্রতি সংখ্যা স্বস্তিকার মূল্য ৪.০০ টাকার পরিবর্তে ৫.০০ হবে এবং বার্ষিক গ্রাহক মূল্য (সডাক) ২০০.০০ টাকার পরিবর্তে ২৫০.০০ টাকা হবে। অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আমরা দুঃখিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী। — সঃ স্বঃ

কংগ্রেস-তৃণমূল জোট কি ভাঙতে চলেছে?

নিশাকর সোম

দক্ষিণ কলকাতা জুড়ে মুখে কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে কংগ্রেসের মৌন মিছিল রাজ্যের রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে। বিশেষ করে কংগ্রেসের পঞ্চায়েতী রাজ-সম্মেলনের পূর্বে এবং দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বিভিন্ন ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাপের কাছে নতিস্বীকার করার পর কংগ্রেসের অধিকাংশ জেলা-সভাপতির চাপে এবং মমতা-কে পাল্টা চাপ দেবার কর্মসূচী নেওয়ার জন্য কংগ্রেস-সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী ইঙ্গিত দিয়েছেন। রাজ্য-মন্ত্রিসভার এক মন্ত্রীতো প্রকাশ্যেই বলছেন ''আমার কোনও কাজ নেই। আমি মন্ত্রিত্বের থেকে পার্টির কাজকেই গুরুত্ব দিই।'' ইনিও দক্ষিণ কলকাতার মিছিলে ছিলেন। ইতিপূর্বে দীপা দাসমুন্সি, অধীর চৌধুরী তো কংগ্রেসের নিজস্ব 'ভূমিকা'কে বড় করার জন্য বারবার কেন্দ্রীয় নেতাদের উপর চাপ দিচ্ছেন। এছাড়া বর্তমানে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীও রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে 'সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী' গ্রহণ করেছেন। রাজ্যসরকার- মুখ্যমন্ত্রীর পাশে রাজ্যপাল আছেন। প্রদেশ সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচার্যও কংগ্রেসের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে তৃণমূলের সমালোচনা করেছেন। কলকাতা জেলাসহ সকল জেলা সভাপতি 'তৃণমূলের অত্যাচারের' বিরুদ্ধে সরব। যদিও কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব জোট বজায় রাখার জন্য কড়া নির্দেশ দেওয়ার পর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেছেন যে, ''ছাত্ররা কর্মসূচী পালন করেছে। এর সঙ্গে জোট ভাঙার কোনও সম্পর্ক নেই।'' এর মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক বেসরকারি বৈদ্যুতিন চ্যানেলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্‌গার করে বলেছেন— ''কংগ্রেস সিপিএমের হাত শক্ত করছে। কংগ্রেস ঠিক করুক তারা কাদের সঙ্গে থাকবে।''

এর অর্থ পরিষ্কার যে এ-রাজ্যে বিধানসভায় তৃণমূল একাই একক সংখ্যাগরিষ্ঠ থেকে সরকার গঠন করতে পারবে। তৃণমূলের একাংশ চাইছে কংগ্রেস-কে বাদ দিয়ে মন্ত্রিসভা চালাতে। ইতিমধ্যেই চারটি রাজ্যে অবস্থান নিয়ে 'অল ইন্ডিয়া পার্টি', মমতার এই ইঙ্গিত নিয়ে কথা উঠেছে যে মমতা বলেছেন তাঁর দলও চারটি রাজ্যে আছে। তাঁর দলও তবে 'অল ইন্ডিয়া' পার্টি। তিনিও 'অল ইন্ডিয়া' নেত্রী।

এ-কথার মাধ্যমে কার্যত তিনিও সোনিয়া গান্ধীর সমান্তরাল নেত্রী। এ-কথাটা সোনিয়া গান্ধী বুঝেই এরাজ্যে তৃণমূলের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অনুমতি দিয়েছেন। বিরোধী দলনেত্রী থাকার সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে মঞ্চ গঠন করে মঞ্চের নামে লাগাতার অনশন ধর্না চালিয়েছিলেন ঠিক সেইরকম ভাবেই এ পি ডি আর সহ ২৬টি সংগঠন মঞ্চ করতে চেয়েছিল। কিন্তু পুলিশ অনুমতি দেয়নি। মাওবাদীদের সঙ্গে আলোচনার জন্য যে চারজনকে মধ্যস্থকারীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব ত্যাগ করে বলেছেন যে— ''রাজ্য সরকার মাওদের সম্পর্কে বন্দিমুক্তি নিয়ে ভুল পথে চলেছে।'' মমতার সহযাত্রী এস ইউ সি-ও বন্দিমুক্তির দাবিতে তাদের গণসংগঠন নিয়ে রাজ্য সরকার-বিরোধী অবস্থান নিয়েছে। এসইউসি-এর সাংসদ এবং একজন বিধায়ক মাওবাদী ও তৎসংশ্লিষ্ট বন্দিদের সঙ্গে দেখা করে সহানুভূতি জানিয়ে এসেছে।

মাওবাদী এক দম্পতির আত্মসমর্পণ নিয়ে প্রচার করা হচ্ছে— তাঁদেরকে বহু আগেই মাওবাদী সংগঠন থেকে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের কারণে বহিষ্কার করা হয়েছে। মাও-সমস্যা নিয়ে রাজ্য-সরকার সর্বদলীয় সভা করতে রাজি নয়। পুলিশ-কেন্দ্রীয়বাহিনী জঙ্গলমহলে পুলিশের চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়ে 'জঙ্গলমহলে বেকারি দূরীকরণের ব্যবস্থা'কে মাওবাদীরা ভাল চোখে দেখছে না। মাওবাদী দমনে মমতাকে রাজ্যপাল ও পুলিশকর্তা নপরাজিত মুখোপাধ্যায় সমর্থন জানিয়েছেন। এছাড়াও তৃণমূলে একাধিক সাংগঠনিক সমস্যা আছে—

(১) বহিষ্কৃত সিপিএম-কর্মীদের দলে নিয়ে ক্ষমতা দেওয়ার বিরুদ্ধে ক্ষোভ। (২) ব্যক্তিগত কারণে সিপিএম-ত্যাগীদের মন্ত্রিসভায় রাখা নিয়েও সমালোচনা আছে। (৩) সোমেন মিত্র, অশোক দেব, তাপস রায় প্রমুখরাও নাকি ক্ষুব্ধ—? (৪) তৃণমূলের নিচের তলার কিছু কর্মী জোর করে সরকারি আবাসনের ঘর এবং অন্যদলের বিভিন্ন পার্টি দখলের কাজে ব্যস্ত হয়েছেন। ভোটের পর মানুষজন সম্পর্কে তৃণমূলের কিছু নিচের তলার কর্মী ভয়-ভীতি দেখাচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এত সব সমস্যা কি মমতা একলাই সামলাবেন?

এদিকে এ-রাজ্যের সিপিএমে এখন ছত্রভঙ্গের হাট। লোকাল সম্মেলন এবং জোনাল সম্মেলনে বহু পার্টিসদস্য উপস্থিত হচ্ছেন না কারণ নিচের তলার কর্মীদের বক্তব্য, 'লোকাল বা জোনাল স্তরের সম্মেলনে কোন ব্যর্থতার দায় নেতারা স্বীকার না করে পার্টির ক্ষমতা দখলের এক নগ্ন লড়াইতে ব্যস্ত। কাজেই নিচের তলার বহু সদস্য সম্মেলনে ভোটাভুটিতে অংশ গ্রহণ সম্পর্কে একেবারেই নিস্পৃহ এবং নির্মোহ।

এদিকে রাজ্য-কমিটির রিপোর্টে বুদ্ধবাবু তাঁর মতো রাজ্যের তৃণমূল- কংগ্রেস জোট সম্পর্কে নিজস্ব মত দিতে চেষ্টা করছেন। সে-মত অবশ্যই পার্টির সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাতের লাইনের বিরোধী। প্রকাশ কারাতের লাইন হলো— ইউপিএ-২নং কে হঠাতে সংসদের মধ্যে সব বিরোধীদের একত্রিত হওয়া দরকার। প্রকাশ কারাতের সাংগঠনিক লক্ষ্য হলো বৃদ্ধ অশক্ত-অসুস্থদের সরিয়ে তরুণ এবং যাঁরা পার্টিনীতির প্রতি অন্ধ আনুগত্য দেখাবেন তাঁদেরই নেতৃত্বের স্তরে উন্নীত করা। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বস্তুত এ রাজ্যের সকল জেলা কমিটি সম্পাদকদেরই তাঁদের পদ থেকে বিদায় নেওয়ার কথা আর এইখানেই সিপিএম নেতৃত্বের লড়াই তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। যার ফলেই পশ্চিমবঙ্গে পার্টির মাথা তোলার শক্তির ক্ষয় হচ্ছে। রাজ্যের পুরানো নেতাদের না সরালে নিচের তলার সদস্যদের উজ্জীবিত করা যাবে না।

মার্কিন মানচিত্রে ভারত-বিরোধিতা

মানচিত্রে ভারত-বিরোধিতা নতুন কিছু নয়। গুগুলের মতো 'সার্চ ইঞ্জিন' কিংবা বৈদেশিক কোম্পানী'র 'ব্রোসিওর'-এ অরুণাচলের তাওয়াং-কে চীনের অংশ অথবা কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অংশ বলে দেখানো হয়েছে আগেই। কিন্তু সেগুলি ছিল বেসরকারি; ইসলামি মৌলবাদী কিংবা খৃস্টান মিশনারি বা কমিউনিস্ট পরিচালিত ষড়যন্ত্র মাত্র। কিন্তু এবার সরাসরি আমেরিকার সরকারি মানচিত্রে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরকে পাকিস্তানের-ই অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে দেখানো হলো, তার ওপর ভারতের অধিকারকে কোনও ধর্তব্যের মধ্যে না এনেই। বৈদেশিক সম্পর্ক সংক্রান্ত ওই মার্কিন ওয়েবসাইটে (www.state.gov) 'ডিপ্লোম্যাসি ইন অ্যাকশন' শীর্ষক বন্ধনীতে সেই সমস্ত দেশের মানচিত্র উপস্থাপিত করা হয়েছে যাদের সঙ্গে আমেরিকার কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। সেখানে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখানোর পাশাপাশি ভারতের মানচিত্র থেকে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরকে বাদ দেওয়া তো হয়েইছে, এমনকী ব্যাপারটিকে 'বিতর্কিত' আখ্যা দেওয়ার ন্যূনতম সৌজন্যটুকুও দেখানো হয়নি।

ফাঁসি নিয়ে ফাঁসে

ফাঁসি নিয়ে রাজনীতি করতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টের ফাঁসে ক্রমশই জড়িয়ে পড়ছে কেন্দ্রীয় সরকার। গত ১৫ নভেম্বর শীর্ষ আদালত কেন্দ্রীয় সরকারকে এযাবৎকাল রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপালের কাছে জমা পড়া ক্ষমাভিক্ষার আবেদনের যাবতীয় তথ্য দিতে নির্দেশ দিয়েছে। বিচারপতি জি এস সিংভী এবং বিচারপতি এস জে মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে গঠিত শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ জানিয়েছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড থেকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ফাঁসির আসামীদের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি প্রতিভাদেবী সিং পাতিলের কাছে বহু বছর ধরে জমা পড়া ১৭টি ক্ষমাভিক্ষার আবেদন তাঁরা বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে দেখেছেন ইতিমধ্যেই। দেবীন্দর পাল সিং ভুল্লুরের আবেদনের ভিত্তিতে বিচারপতিরা এই কথা জানান। জানা গিয়েছে যে বিচারপতিদ্বয়ের অনুরোধে রাম জেঠমালানী এবং টি আর আন্ধার্জুনিয়ারের মতো বরিষ্ঠ আইনজীবী আদালতকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে এগিয়ে

এসেছেন। সব মিলিয়ে পরিস্থিতিটা কেন্দ্রের পক্ষে আদৌ স্বস্তিজনক নয়। কারণ রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রতিভা পাতিল ফাঁসির আসামী'র ক্ষমাভিক্ষার আবেদনে কর্ণপাত করবেন কিনা, সেটা তাঁর ওপর যত না নির্ভর করে, তার চেয়ে অনেক বেশি নির্ভর করে কেন্দ্রীয় ক্ষমতাসীন মন্ত্রিগোষ্ঠী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তথা কেন্দ্র সরকারের ওপর।

পিতা-পুত্রের গুণাবলী!

গুণধর পুত্রের সর্বগুণান্বিত পিতা। গুণধর পুত্রের নাম ওমর আবদুল্লা, যিনি আপাতত জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী। বুঝতেই পারছেন, পিতার নাম ফারুক আবদুল্লা, যিনি ছিলেন জম্মু-কাশ্মীরের একদা মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও। পাক-সন্ত্রাসবাদীদের মুক্তাঞ্চলে কাশ্মীরকে পরিণত করতে এই দুই গুণধর পিতা-পুত্রের ভূমিকা-ই অসীম। যার সর্বশেষ নিদর্শন হলো জম্মু-কাশ্মীর থেকে আফস্পা ('আর্মড ফোর্সেস স্পেশ্যাল পাওয়ারস অ্যাক্ট' বা এ এফ এস পি এ) প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য কেন্দ্রের কাছে বিরামহীন দরবার। এ ব্যাপারে পুত্রের 'অকাট্য' যুক্তি— 'পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ইদানীংকালে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। সুতরাং...'। পিতাকে সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনার পুত্র পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের ইদানীন্তন সম্পর্কের উন্নতির 'ঐতিহাসিক' তথ্যটা পেলেন কোথায়? ক্ষুব্ধ পিতা সটান জবাব দিয়ে বসেন— ''এতে পাওয়া-পায়ির কি আছে! মুখ্যমন্ত্রী হলেন গিয়ে রাজ্যের বস। তিনি যদি উপলব্ধি করেন যে পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে এবং পরিস্থিতিরও উন্নতি হয়েছে, তবে তাই হয়েছে বলে মানতে হবে।'' আহা! এই না হলে পিতা। পুত্রকে পৈতৃক-সম্পত্তি দিতে কি আকুলি-বিকুলি!

নিষিদ্ধ ক্যান্সারের ঔষধ

আমেরিকা এবং ভারতে ক্যান্সারের প্রতিষেধক হিসেবে আভাসটিন ড্রাগটি বহুল প্রচলিত। কিন্তু অতি সম্প্রতি মার্কিন খাদ্য ও ঔষধ প্রশাসনিক দপ্তরের (ইউ এস ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) পক্ষ থেকে 'নিরাপদ নয়' বলে আভাসটিনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। রোচ (Roche) কোম্পানী'র তৈরি করা ক্যান্সার রোগের এই ঔষধটি যন্ত্রণা-র হাত থেকে মানুষকে সাময়িকভাবে রেহাই দিলেও এর বিভিন্ন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দীর্ঘদিন ধরেই লক্ষ্য করেছিলেন ডাক্তাররা। যেমন এর ফলে রক্তচাপের মাত্রা এতই বেড়ে যায় যে রক্তক্ষরণ থেকে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। মলাশয়, ফুসফুস, কিডনি এবং মস্তিষ্কের ক্যান্সারের ক্ষেত্রেই মূলতঃ এই ড্রাগটি ব্যবহৃত হয়। তবে ডাক্তাররা বলছেন, প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যান্সার রোগ নিরাময় দূরের কথা, যন্ত্রণার সামান্য উপশম করতেই অনেক বেশি 'ডোজ' আভাসটিন ঔষধটি খেতে হোত। যার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ক্যান্সার ঘাতকের চেয়েও অনেক আগে মানুষকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিত। আমেরিকা এর বিক্রয় নিষিদ্ধ করায় আভাসটিনের অন্যতম বড় খরিদ্দার ভারত এখন কি ব্যবস্থা নেয় সেটাই দেখার।

চিকিৎসা ব্যবসায় না

চিকিৎসা ব্যবসায় লাগাম টানতে সরকারকে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। গত ১৭ নভেম্বর বিচারপতি জি এস সিংভী এবং বিচারপতি এস জে মুখোপাধ্যায়ের বেঞ্চ ঔষধ এবং চিকিৎসার খরচ যেভাবে প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে উদ্বেগ প্রকাশ করে মন্তব্য করেন, ''রামমনোহর লোহিয়া, সফদরজং এবং এইমস-এর মতো হাসপাতালগুলি না থাকলে ১০ শতাংশ মানুষ পুরোপুরি নিঃস্ব হয়ে যেতেন।'' শীর্ষ আদালতের আঙুল স্পষ্টতই বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে। যাদের ব্যবসায়িক নীতিই হলো চিকিৎসার নামে সাধারণ মানুষকে ক্রমাগত মোচড় দিয়ে টাকা আদায় করে সর্বস্বান্ত করে দেওয়া। এদিকে লক্ষ্য রেখেই একটি জনস্বার্থ মামলার রায়ে স্বল্পমূল্যে অবশ্যপ্রয়োজনীয় ঔষধ যাতে সাধারণ মানুষ পান সে বিষয়ে ক্ষমতাসীন মন্ত্রিগোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় খসড়া নীতি প্রস্তুত করবার পরামর্শ দিয়েছেন শীর্ষ আদালত। সেই সঙ্গে বেসরকারি হাসপাতালে রক্তপরীক্ষা থেকে অন্যান্য চিকিৎসা-সংক্রান্ত পরীক্ষার অকারণ বিপুল খরচের বোঝা যাতে জনসাধারণকে বইতে না হয় সে ব্যাপারেও ক্ষমতাসীন মন্ত্রিগোষ্ঠীকে দায়িত্বশীল হতে বলেছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত।

কালো টাকা কংগ্রেসকে কালো করেছে

অমলেশ মিশ্র

আমাদের দেশে এখন কালো টাকা নিয়ে ব্যাপক কৌতূহল তৈরি হয়েছে। কালো টাকা নিয়ে খুব বড় করে প্রশ্ন তোলে বিজেপি ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে। দলের পক্ষ থেকে বলা হয় যে কংগ্রেস সরকারের প্রশ্রয়ে জনগণের শ্রমে সৃষ্ট সম্পদ বে-আইনী ভাবে চলে যাচ্ছে ব্যক্তিগত পকেটে। ইস্যুটা খুব ভালো থাকলেও কালো টাকার ব্যাপারটা জনগণ খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখেনি কারণ কালো টাকা ব্যাপারটা বোঝেন খুব কম মানুষ। সাধারণ ভোটাররা বোঝেনই না বলা যায়।

যাইহোক, বিরোধীদের চাপে কংগ্রেসও ঘোষণা করে যে তাদের সরকার কালো টাকা উদ্ধার করবে। ১০০ দিনের সময় সীমাও দেয়। কিন্তু দু'বছরেও সরকার কিছু করেনি। রাজনৈতিক বিরোধী দলগুলি শুধু নয়, ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ও কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এমন কথা বলেছে ও এমন কাজ করেছে যে মনে করার কারণ আছে যে সরকার চায় না কালো টাকার মালিকদের নাম দেশবাসী জানুক বা কালো টাকা উদ্ধার হোক।

অতি সম্প্রতি বাবা রামদেব কেবল মাত্র কালো টাকা নিয়েই একটি আন্দোলন শুরু করেছিলেন। সরকার আন্দোলন তো ভেঙ্গে দিলই উপরন্তু এতদিন রামদেব সম্পর্কে যা বলেনি— তাই-ই বলতে শুরু করল। উদ্দেশ্য একটাই যে কালো টাকা নিয়ে সরকার ব্যতীত আর কেউ মাথা ঘামাবে না, এইটা বুঝিয়ে দেওয়া।

আন্না হাজারে অনশন করলেন। সরাসরি কালো টাকা নয়। দুর্নীতির বিরুদ্ধে। কালো টাকা তৈরি হয় দুর্নীতিতেই। তাই কালো টাকা কাদের তা অনুমান করতে গিয়ে প্রথমেই মন্ত্রী, সাংসদ, ব্যবসায়ী প্রমুখের নাম এসে যায়। তারপর কালো টাকা উদ্ধারে সরকারের অনীহা অনুমানকে সন্দেহতে পরিণত করে।

বিজেপির প্রধান নেতা লালকৃষ্ণ আডবানী একমাসের জন্য রথযাত্রায় বেরিয়েছেন। সারাদেশে প্রচারে তাঁর একটাই ইস্যু--- কালোটাকা। কতটা সফল হবেন সন্দেহ আছে।

জনচেতনা রথযাত্রার সূচনায় মঞ্চে আদবানী সহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

কারণ দেশের সংবাদ মাধ্যমের একাংশ কালোটাকা বিষয়টাকে কতটা গুরুত্ব দেয়, তার থেকেও বড় কথা— বিজেপির গুরুত্ব তারা বাড়তে দিতে চায় না।

তবে কালো টাকা কী এটা না বুঝলেও সাধারণ ভোটাররা ক্রমশ কিছু কৌতূহল প্রকাশ করেছেন। কালোটাকা কী? ফাঁকি দিয়ে বা আইন লঙ্ঘন করে যে অর্থ অসৎ ব্যক্তি ও সংস্থা গোপনে নিজেদের পকেটে (আয়ত্তে) রাখে এবং বিদেশের কোনও ব্যাঙ্কে জমায় তাকেই সাধারণত কালো টাকা বলে। যে টাকা বেআইনী পথে অসৎ উপায়ে, সরকারি কর্তৃপক্ষের অগোচরে, কর ফাঁকি দিয়ে আয় করা হয় বা হস্তান্তরিত করা হয় অথবা ব্যয় করা হয় সেটাই কালো টাকা। দেশের ভিতরেও কালো টাকা থাকতে পারে।

গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটি (জি. এফ. আই) রিপোর্ট অনুসারে ভারতে মোট কালো টাকার পরিমাণ ৬৪ হাজার কোটি ডলার (১ ডলার সমান ৫০ টাকা) ধরলে দাঁড়ায় ৩২ লক্ষ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১৭ হাজার ৮০০ কোটি ডলার রয়েছে দেশের ভিতরেই গোপনে আর বাকী ৪৬ হাজার ২০০ কোটি ডলার (২৩ লক্ষ ১০ হাজার কোটি টাকা) আছে বিদেশের ব্যাঙ্কে।

বলা দরকার যে এই বিপুলায়তন কালো টাকা বাজেয়াপ্ত করে ভারতে যদি ফিরিয়ে আনা যায় তাহলে এই টাকার অর্ধেক হলেই ভারতের সমূহ বিদেশী ঋণ (যখন ২৩ হাজার কোটি ডলার) এক দিনেই শোধ হয়ে যায়।

১৯৪৮ সাল থেকেই দেশের কিছু অসৎ মানুষ বিদেশের ব্যাঙ্কে টাকা পাচার করে আসছেন।

১৯৪৮ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ৬১ বছরে প্রায় ২২ লক্ষ কোটি টাকা দেশ থেকে গোপনে পাচার হয়েছে বিদেশের ব্যাঙ্কে। ২০০৪ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে পাচার হয়েছে ৪ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকা (৯৬০০ কোটি ডলার)। ২০০৯ সালে বিশ্বের মোট কালো টাকার পরিমাণ যদি ১০০ ধরা হয় তাহলে এর মধ্যে শুধু ভারতেরই আছে ৫৪.২ টাকা। ১৯৯৫ সালেও ভারতের কালো টাকার পরিমাণ বিশ্বের মোট কালো টাকার ৩৬.৪ শতাংশ ছিল। ১৯৯৬ সালে নরসীমারাও প্রধানমন্ত্রী হন, অন্যান্য দলের সাংসদ ভাঙ্গিয়ে সরকারের সমর্থন সংগ্রহ করেন। টাকা পয়সার ব্যাপক লেনদেন হয়েছিল। তারপর থেকে বিদেশের ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের কালো টাকা জমানোর হার বেড়ে যায়।

বর্তমানে সারাবিশ্বে ৯১টি জায়গা আছে যেখানে কালো টাকা পাচার হয়ে জমা হয়। এ বাবদে সুইজারল্যান্ডের নাম বেশি আসে কারণ ওইখানে আমানতকারীদের নাম, তথা অর্থের পরিমাণ ইত্যাদি কঠোরভাবে গোপন রাখা হয়।

এটি আয়কর মুক্ত দেশ। এখন কালো টাকা জমাবার জন্য অনেক দেশই আছে যেমন থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, হংকং, ম্যাকাও, মরিশাস, লুক্সেমবার্গ লিচটেনস্টাইন চ্যানেল আইল্যান্ড, বাহামা, মরিশাস ইত্যাদি।

কালো টাকার মালিক হন অসৎ শিল্পপতি, রাজনীতিক এবং আমলা। তাঁদের মধ্যে অনেক সময় যোগাযোগও থাকে। অনেক সময় (১) বিশেষ বিমান বা চার্টার্ড বিমানে দিল্লী বা মুম্বাই থেকে কালো টাকা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া। (২) ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় দেশের কোনও ব্যাঙ্কে স্থানান্তরিত করা। (৩) রপ্তানির সময় পণ্যের কর কমিয়ে দেখান। (৪) আমদানির সময় পণ্যের কর বাড়িয়ে দেখানো। (৫) হাওলা বা হুন্ডি। (৬) সীমান্তে মুদ্রার চোরা চালান। এ ভাবেই কালো টাকা জমা ও চালান হয়।

বিদেশের ব্যাঙ্কে কালো টাকা কারা জমা রেখেছে তাদের কিছু নাম সরকার জেনেছে। কিন্তু অর্থমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী সেই নামগুলি প্রকাশ করতে চান না। এ বিষয়ে সুপ্রীম কোর্ট যথেষ্ট কড়া মন্তব্য করলেও, সরকার তা গ্রাহ্য করছে না। অনুমান করা যায় কান টানলে মাথা আসতে পারে— এই আশঙ্কায়, নামগুলি প্রকাশ করতে সরকারের অনীহা। সরকার ওইসব টাকা পাচারকারীদের আড়াল করতে চাইছে বলে অনুমান করেছেন অনেকে। পরবর্তী আলোচনা এবং প্রকাশিত তথ্য থেকে এই অনুমান যথার্থ বলেই মনে হবে।

সারা বিশ্বের মোট কালো টাকার অর্ধেকেরও বেশি (৫৪.২ শতাংশ) শুধু ভারতের। ১৯৯৫ সালে ছিল ৩৬.৪ শতাংশ। স্বাধীনতার পর এই ৬৩ বছরের বছর দশেক বাদ দিলে ৫০ বছরেরও বেশি কাল একটাই দল এবং একটাই পরিবার ভারত শাসন করে চলেছে। তাহলে এই কালো টাকার দায় মূলতঃ সেই দল ও সেই পরিবারকেই নিতে হয়।

দায় নেওয়াতো পরে, ওই কালো টাকা উদ্ধারেরও কোনও চেষ্টা নাই। যা হচ্ছে এসব প্রায় লোক দেখানো। কাদের টাকা বিদেশের ব্যাঙ্কে লুকানো আছে তাদের সকলের না হলেও যে কয়েকজনের নাম এসেছে— সেই নামগুলো প্রকাশ করছে না কেন্দ্রীয় সরকার। সাম্প্রতিকতম ঘটনা হাসান আলির। এই ব্যক্তি সুইজারল্যান্ডের বিপুল টাকা জমিয়েছেন। সরকারি হিসাবে হাসান আলির সুদ সহ বকেয়া করের পরিমাণ ৭০ হাজার কোটি টাকা। মুম্বাই হাইকোর্টে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হলো। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলো আবার জামিনও পেয়ে গেলেন। তাঁর জামিন আটকানোর ব্যাপারে সরকারের কোনও উদ্যোগ ছিল না।

গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটি (জি. এফ. আই) রিপোর্ট অনুসারে ভারতে মোট কালো টাকার পরিমাণ ৬৪ হাজার কোটি ডলার (১ ডলার সমান ৫০ টাকা) ধরলে দাঁড়ায় ৩২ লক্ষ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১৭ হাজার ৮০০ কোটি ডলার রয়েছে দেশের ভিতরেই গোপনে আর বাকী ৪৬ হাজার ২০০ কোটি ডলার (২৩ লক্ষ ১০ হাজার কোটি টাকা) আছে বিদেশের ব্যাঙ্কে।

বিদেশে বা কোনও করমুক্ত অঞ্চলে জমা কালো টাকা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের দুটি রাস্তা আছে। (১) ডাবল্ ট্যাক্সেসন এ্যাভয়ডেন্স এগ্রিমেন্ট (ডি.টি.এ.এ.) এবং (২) ট্যাক্স ইনফরমেশন এক্সচেঞ্জ এগ্রিমেন্ট (টি.টি.এ.) কর ফাঁকি ধরতে ডিডিটিএ খুব একটা কার্যকর নয়। কিন্তু ভারত সরকার ৭৯টি দেশের সঙ্গে এই চুক্তি করেছে এবং বলছে দেখ আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে ডি টি এ এ চুক্তি হয়েছে তবে কার্যকর হতে কয়েকমাস লাগবে। তত দিনে কালো টাকার মালিকরা টাকা অন্যত্র নিয়ে চলে যেতে পারবে।

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এখন কানে-তে জি ২০ ভুক্ত দেশগুলির সম্মেলনে তিনি কালো টাকা উদ্ধারের বিষয়ে উদ্যোগ প্রকাশ করেছেন।

উল্লেখ্য যে ২০০০ সালে গড়ে উঠেছিল গ্লোবাল ফোরাম অন ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ফর ট্যাক্স পারপাস। ২০০৯ সালে এই ফোরাম পুনর্গঠিত হয়। ২০০৯-২০১০ সালে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ৫০০টি চুক্তি হয়েছে। অর্থ পাচারকারীদের কাছ থেকে জার্মানি ৫৪০ কোটি, বৃটেন ৮২ কোটি, ফ্রান্স ১৩০ কোটি, ইতালি ৬৭০ কোটি, গ্রিস ৪৮০০ কোটি ডলার উদ্ধার করেছে। ভারত আজ পর্যন্ত কর সংক্রান্ত তথ্য বিনিময় চুক্তি করতে পারেনি।

কালো টাকার মালিকরা একটি ট্রাস্ট গঠন করে দেশে। ট্রাস্টের অধীনে গঠিত হয় কোম্পানী। কোম্পানী ডিভিডেন্ড ঘোষণা করে— ট্রাস্টের হাতেই টাকা চলে আসে।

লিচটেনস্টাইনের ব্যাঙ্কে ভারতীয় আমানতকারীদের ৪০ জনের নাম জার্মান সরকারের মাধ্যমে ভারতের হাতে এসেছে ২০০৮ সালে। সুইসব্যাঙ্কে ভারতীয় আমানতকারীদের নামও পৌঁছে গেছে উইকিলিক্সের হাতে। তাদের নাম প্রকাশিত হওয়ার সম্ভবনায় তারা এখন টাকা স্থানান্তরিত করছে দুবাইতে। এখানকার ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখলে টাকার উৎস সম্পর্কে বেশি প্রশ্নের জবাব দিতে হয় না। ওখানে টাকা পাঠানো সহজ। দুবাই মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলে একটি কোম্পানী গঠন করতে হয় এবং কোম্পানীর নামে দুবাই-এর কোনও ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে হয়। তারপর সুইজারল্যান্ড বা অন্যান্য করমুক্ত এলাকার ব্যাঙ্কে জমানো টাকা দুবাই-এর ব্যাঙ্কে স্থানান্তরিত করে দিলেই হলো। দুবাই ছাড়াও আছে সিঙ্গাপুর। তবে সিঙ্গাপুরে আয়ের উপর ১৭ শতাংশ কর দিতে হবে। সিঙ্গাপুরে টাকা জমা হয়ে গেলে কালো টাকা, সাদা টাকার গ্যারেন্টি পেয়ে যাবে।

ভারত সরকার যেভাবে কালো টাকার বিষয়টি দেখছেন তার ফলে টাকা উদ্ধার হওয়ার সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল নয়। অথচ এই ৩২ লক্ষ কোটি টাকা চোরাই টাকা। এই টাকা উদ্ধার করতে পারলে দেশ ঋণ-মুক্ত-দারিদ্রমুক্ত হতে পারত।

সারাদেশে বিজেপি এবং বামদলগুলি ব্যতীত আর তেমনভাবে কোনও দল বিষয়টি নিয়ে লড়ছে না। তবে আদবানী জনচেতনা তৈরির চেষ্টা করছেন সক্রিয়ভাবে। বামদলগুলি কেবল মুখেই বলছে, কাজে লবডঙ্কা।

(তথ্যসূত্র : পরিসংখ্যানগুলি হরিনাথ লাল লিখিত ১৫.০৩.১১ তারিখে প্রকাশিত 'কালো টাকা' পুস্তিকা থেকে গৃহীত।)

স্টিভ জোবস বিজ্ঞানী হয়েও তপস্বী

অতিথি কলম

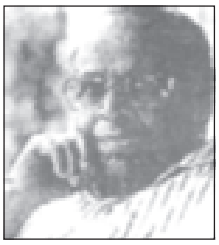

ডঃ জয় দুবাসী

বেশ কিছু বছর আগে ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত পওলো অল্টো অঞ্চলে আমার ছেলের বাড়িতে আমাকে কয়েক মাস থাকতে হয়েছিল। আমার বাসস্থানের কয়েক মিটারের কাছেই থাকতেন সম্প্রতি প্রয়াত ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার স্টিভ জোবস। সেই সময় পাওলো অল্টো এখনকার মতো বিখ্যাত জায়গা হয়ে ওঠেনি। যদিও হিউলেট প্যাকার্ড বা সান মাইক্রো সিস্টেমের মতো বিখ্যাত কোম্পানীগুলির যেখানে অফিস ছিল।

মনে পড়ে অসময়ে সাদা হয়ে যাওয়া চুল নিয়ে একজন রোগা লম্বা মানুষ তার কুকুরটির সঙ্গে

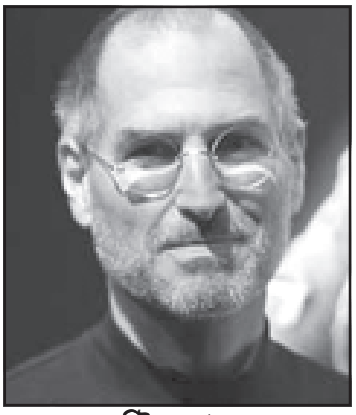

স্টিভ জোবস

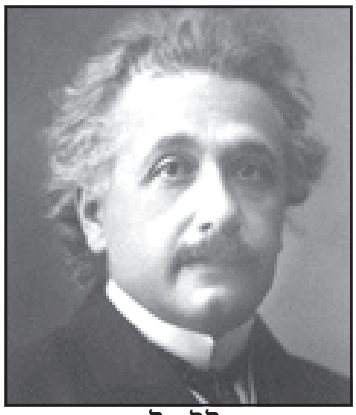

আইনস্টাইন

ওপেনহাইমার

অনর্গল বকতে বকতে চলেছেন। সবিশেষ ভাবে আমেরিকান লক্ষণাক্রান্ত ইনিই ছিলেন স্টিভ জোবস। চলার মধ্যেই উনি মাঝে মাঝে পথচারীদের দেখে মাথা নাড়ছেন যা আমার সঙ্গেও ঘটত।

সেই সময় আমি কিন্তু আদৌ জানতাম না উনি কে। অনেক বছরের ব্যবধানে আবার 'পাওলো অল্টো' গিয়ে এক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দোকানের সামনে ওঁকে গাড়ী পার্ক করতে দেখি। আমিও ওই দোকানে থাকায় দেখলাম দোকানের কর্মচারীরা জোবসের সম্বন্ধে বলাবলি করছে। আই প্যাড আই ফোন কম্পিউটার যন্ত্রপাতির ওপর আমার সেরকম আগ্রহ না থাকলেও অন্যান্য ক্রেতাদের আচার-ব্যবহারে এটুকু বুঝলুম ইনি একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি। জোবস সম্প্রতি মারা গেছেন। সারা পৃথিবীই তাঁর অকাল মৃত্যুশোক পালন করছে। কিন্তু জোবসের জোবস হয়ে ওঠার আগে এই ভারতবর্ষে যে গোটা একটি বছর কাটিয়ে গেছেন এ তথ্য চমকপ্রদ। জোবস-এর কাছে সময়টা খুব সাধারণভাবেই কেটেছিল। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জোবস ভারতে থাকাকালীন 'হিপি' হয়ে যান। স্বাভাবিকভাবেই 'ড্রাগ' নেওয়া শুরু করেন। কিন্তু পরের স্তর বম্বে-গোয়ার দেহ ব্যবসায়ীদের সংসর্গ না করে তিনি বারানসী ও মথুরা ভ্রমণ করেন। এরপর বাকি সময়টা তিনি সাধু হিসেবে হিমালয়ের পথে বেড়িয়েছেন। এই সময় তিনি হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। বেনারসের লোকেদের কাছে এমনও শোনা যায়, তিনি বাকি জীবনটা হিন্দু বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হিসেবেই কাটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাধ সাধেন তাঁর মা। তিনি ছেলেকে আমেরিকায় ডেকে নেন।

দেখা যায় জীবনে বিপুল সাফল্য সত্ত্বেও জোব চিন্তা ভাবনায় ছিলেন একজন তপস্বী আর এই সংযমই প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁর সৃষ্টি করা অজস্র বৈদ্যুতিন উপকরণগুলির মধ্যে। বাস্তবে তাঁর আবিষ্কৃত জিনিসগুলোর সহজবোধ্যতা ও দৃষ্টিনন্দন চেহারাই তাঁর গ্রাহকদের মুগ্ধ করে রেখেছিল। এই সরল সহজ সৌন্দর্য চেতনা কি তবে তাঁর ভারতবাসের ফলশ্রুতি? আমার কেমন যেন মনে হয় ঠিক তাই। জোব ভারতবর্ষে এসেছিলেন বা বলা ভাল ভারতবর্ষ তাঁকে আকর্ষণ করে এনেছিল। হ্যাঁ, হিন্দু ভারতবর্ষের বিশেষত্বই তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হয় এটা জেনে যে প্রথম জীবনে তিনি পয়সা জমিয়ে সুযোগ পেলেই সানফ্রানসিসকোর 'হরে-কৃষ্ণ আশ্রমে' গিয়ে হিন্দু রীতিতে তৈরি খাবার আনন্দ করে খেতেন। স্বভাবতই খাবার ছিল সাদামাঠা ভারতীয় খাবার, কিন্তু জোবসের কাছে তা মনে হোত স্বর্গীয় উপহার।

আমি বরাবরই মনে করেছি বিশুদ্ধ বিজ্ঞান চর্চা ও অধ্যাত্মবাদের মধ্যে সম্পর্ক অতি নিবিড়। যার আর এক অর্থই হচ্ছে বিজ্ঞানের অনুসন্ধান ও হিন্দুত্বের অনুসন্ধান সমার্থক। বিজ্ঞান আদতে একটি দর্শন আর মহান বৈজ্ঞানিকেরা সকলেই বিশিষ্ট দার্শনিক। সেই নিরিখে হিন্দুত্ব এমন একটি অনাড়ম্বর সর্বব্যাপী দর্শন যা শুধু এই জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, ইহজীবনোত্তর পরম্পরার দিকেও তা ধাবমান। তাই হিন্দুত্বের জন্য অন্বেষণ--- সত্যেরই অন্বেষণ আর সত্যই বিজ্ঞানের অভীষ্ট। জোবসকে যাদুকর আখ্যা দেওয়া হয়েছে। হায়! আমাদের মহান ঋষিরাও ছিলেন যাদুকর। তাই জোবসের পক্ষে হিন্দু ও হিন্দুত্বের মধ্য থেকে অনুপ্রেরণার সন্ধান করা

একান্তই স্বাভাবিক। নিদেনপক্ষে তাঁর অবচেতনায় তো বটেই।

পৃথিবীর সমস্ত মহান বৈজ্ঞানিক, যাঁদের মধ্যে কারিগরী বিশারদরাও পড়েন তাঁদের কাজের ধারার মূল উপাদান ও সংবেদনশীলতায় তাঁরা সকলেই হিন্দুত্ব ভাবধারার খুব কাছাকাছি চলে আসেন। এ প্রসঙ্গে প্রথম পারমাণবিক বোমার উৎক্ষেপণ কৌশল ও বোমা তৈরির কৃৎকৌশল নির্ধারণের পুরোধা রবার্ট ওপেনহাইমার-এর কথা বলা যায়— যিনি নিউ মেক্সিকোর অন্তর্গত লস আলমোসের প্রথম সভাটিতে পৌরোহিত্য করেছিলেন। ওপেনহাইমারের মতো অন্য পদার্থবিদেরা, যাঁরা আণবিক বোমা তৈরির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরাও সকলে ছিলেন ইহুদী। নির্দিষ্ট স্থানে আণবিক যন্ত্রটির পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের সময় ওপেনহাইমারের সঙ্গে এঁরা সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

বিস্ফোরণটি হয়ে যাওয়ার পরেই প্রধান বিজ্ঞানী ওপেনহাইমার দু' আঙুলের ফাঁকে একটু মাটি তুলে নিয়ে যে কথাক'টি বলেছিলেন সেটি একটি সংস্কৃত শ্লোক— যার বাংলা অনেকটা হয়তো এরকম— ''হে একাধারে সৃষ্টিকর্তা ও সংহারক, তোমাকে জানাই প্রণতি''।

আশ্চর্য এমন একটি প্রতিক্রিয়া কেবল মাত্র হিন্দুদের কাছেই প্রত্যাশিত, কেননা তারা যে কোনও বস্তু থেকেই অপ্রয়োজনীয় অংশগুলিকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র অপরিহার্যটিকেই চিহ্নিত করতে পারে। কিন্তু ওপেনহাইমার হিন্দু ছিলেন না, তিনি তো ইহুদি ছিলেন। এই গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়াতেই পড়ে পরমাণুর (atom) কথা, বিদ্যুৎ পরমাণুর (electron) কথা যাদের সঙ্গে কিছুই আর যুক্ত নেই তারা নিজেরা ছাড়া। এই বিদ্যুৎ পরমাণুই Electronic Industry (বৈদ্যুতিন শিল্পের) মূল (basis)। এ থেকে এটাই প্রমাণ হয় ওপেনহাইমার ও স্টিভ জোবস যে সৃষ্টি করেছিলেন বা করতে চেয়েছিলেন তার সঙ্গে হিন্দু বিশ্বের যোগসূত্র খুবই প্রত্যক্ষ। সেই কারণেই কর্মধারাই তাঁদের হিন্দুত্বের দিকে আকর্ষিত করেছিল।

এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে ওপেনহাইমার কেবল একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ মাত্র নয়। আমি প্রথম ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গিয়ে লন্ডনে অঙ্কের একটি বিষয়ে ভর্তি হয়েছিলাম। আমার অঙ্কের শিক্ষক ছিলেন হাইম্যান লেভী যিনিও ছিলেন একজন ইহুদী। এই লেভীই কিছুকাল পরে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। তাঁর ক্লাসে তিনি প্রথমেই আমাকে প্রশ্ন করেন, আমি হিন্দু কিনা। উত্তর হ্যাঁ হওয়াতে তিনি অনেক হিন্দু আঙ্কিক ও হিন্দু দার্শনিকদের সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন। তাঁর মতে এঁদের অবদান শতাব্দী ধরে অঙ্কের দর্শনকে সমৃদ্ধ করেছে। পরবর্তী কালে দেখেছি লেভী ছিলেন সাম্যবাদী, তাতে অবশ্য আমাদের বন্ধুত্বে কোনও ভাটা পড়েনি।

পৃথিবীর অবিসম্বাদিত শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনস্টাইন ছিলেন ইহুদী। কিন্তু একথা সকলেরই জানা যে সারাজীবন তিনি হিন্দু দর্শনের প্রতি কী প্রবল অনুরক্ত ছিলেন এবং তাঁর শেষ ইচ্ছে ছিল মৃত্যুর আগে একবার ভারতবর্ষে আসবেন। এই মানুষটি ছিলেন আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বাসী, ঠিক যেমনটি ছিলেন স্টিভ জোবস। তাই দু'জনেই প্রবলভাবে আকর্ষিত হয়েছিলেন একটি বিশ্বজনীন ধর্মের প্রতি যার নাম হিন্দু ধর্ম।

আইনস্টাইন ও জোবস দু'জনের কেউই জটিল যন্ত্রপাতি বা মেশিন নিয়ে কাজ করতেন না। হিন্দুরাও তা করে না। আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে আইনস্টাইনের লেগেছিল কয়েকটা কাগজ ও গোটা কয়েক ছুঁচালো পেনসিল। অথচ এই টুকরো কাগজের ওপর লেখা তত্ত্বটিই পৃথিবীকে বদলে দিল। আইনস্টাইন এই কাজ করেছিলেন সুইজারল্যান্ডের বার্ন শহরের ছোট একটি অফিসে বসে ঠিক যেমন স্টিভ জোবস করেছিলেন আগে বলা ক্যালিফোর্নিয়ার 'পালো আল্টোয়'। আইনস্টাইন $E=mc^2$ উদ্ভাবন করে পৃথিবীর রহস্যকে স্কুল ছাত্রের অনুধাবন সীমার মধ্যে এনে দিয়েছিলেন। আর স্টিভ জোবস যিনি হিন্দু খাবার খাওয়ার আশায় মাইলের পর মাইল পথ অতিক্রম করেছিলেন, তিনিও পৃথিবীকে সংকুচিত করে তাঁর অসামান্য ছোট্ট দৃষ্টিনন্দন দেশলাই বাক্সের মতো মাপের যন্ত্রগুলিতে আবদ্ধ করে দিয়েছেন যা একটি শিশুও চালাতে পারে। আইনস্টাইন যদি যাদুকর হন জোবসও ছিলেন তাই। যিনি একসময় কলেজ থেকে পালিয়েছিলেন, আজ অকালে পৃথিবী থেকেই পালিয়ে গেলেন।

মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমে সংস্কৃত কি এখনও অবহেলিত হবে?

নবকুমার ভট্টাচার্য

ভাষা মানুষের সবচেয়ে অভিনব ও শক্তিশালী উদ্ভাবন। তার সকল উদ্ভাবন ও প্রগতির সোপান ভাষাই তৈরি করেছে। ১৭৮৪ সালে স্যার উইলিয়ম জোনস এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেছিলেন— ''সংস্কৃত ভাষা তার পুরবৃত্ত যাই হোক না কেন একটি আশ্চর্যজনক সংগঠনের অধিকারী, গ্রিকের চেয়ে পূর্ণ, লাতিনের চেয়ে প্রাচুর্যপূর্ণ, এর দুটোর চেয়ে অধিকতর চমৎকারভাবে সুসংস্কৃত অথচ দুটোর সঙ্গেই তার বেশ মিল, ক্রিয়ামূল ও ব্যাকরণরূপ উভয়েই— যা নেহাত আকস্মিকভাবে হয়েছে বলে সম্ভবত ধরা যাবে না।' সংস্কৃত দেশের ঐতিহ্যমণ্ডিত এক প্রাচীন ভাষা। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব নামে যে আধুনিক বিষয়টি সব দেশের ভাষাবিদ ও দার্শনিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার উদ্ভব হয় সংস্কৃত চর্চা থেকে। এদেশে ভাষাতত্ত্বের আলোচনা যেরকম বৈজ্ঞানিক ভাবে হয়েছে এমন বোধহয় আর কোথাও নয়। ভাষাতত্ত্বের শাখাগুলির মধ্যে ধ্বনিতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে ঋক্ প্রাতিশাখ্যে, আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে। অর্থতত্ত্ব আলোচনা হয়েছে পতঞ্জলির মহাভাষ্যে ভর্তৃহরির বাক্যপদীয়ে। আজকের ভাষাতত্ত্বে পাশ্চাত্য জগতে যে সব আলোচনা হচ্ছে তার অনেক কিছুরই সূত্র এই আকর থেকে এসেছে। ভারতীয় দর্শন নিয়ে চর্চা করতে গেলে সংস্কৃত জানতে হবে। এদেশের সমাজব্যবস্থার উৎস জানতে গেলেও সংস্কৃত জানা প্রয়োজন কারণ সংস্কৃত না জানলে মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি বইগুলি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। আর রবীন্দ্রনাথের কথায়— 'একথা স্বীকার করতেই হবে, সংস্কৃতের আশ্রয় না নিলে বাংলাভাষা অচল। কী জ্ঞানের কী ভাবের বিষয়ে সাহিত্যের যতই বিস্তার হচ্ছে ততই সংস্কৃতের ভাণ্ডার থেকে শব্দ এবং শব্দ বানাবার উপায় সংগ্রহ করতে হচ্ছে।' সংস্কৃত ভাষা বাংলা ভাষার জননী স্বরূপা। বাংলাভাষা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে শব্দের জন্য সংস্কৃত ভাষার কাছে দাবি জানিয়েছে। সংস্কৃত ভাষা উদার হাতে বাংলা ভাষার দাবি মিটিয়েছে— এর ফলে গড়ে উঠেছে বাংলা ভাষার ঐশ্বর্যপূর্ণ শব্দভাণ্ডার। তাছাড়া বাক্‌পরিমিতি, ধ্বনি ও লালিত্যের জন্য বাংলা ভাষায় সংস্কৃত নানাভাবে তার কাজ করে সৃজন প্রক্রিয়ায়। বাংলা সাহিত্যকর্মে সংস্কৃত জুগিয়েছে শব্দের ধ্বনি ও সৌন্দর্যচেতনা। তাই সহজেই রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু সংবাদের শিরোনামে লেখা হয়ে যায় 'রবি অস্তমিত'। আজও সংবাদপত্রের ভাষা নির্মাণে

সংস্কৃত শব্দ কতভাবে সহায়তা করছে।

সলিল সমাধি, গ্রীষ্মের দাবদাহ প্রভৃতি শিরোনাম সংস্কৃতের উৎস ছাড়া সম্ভব নয়। সংস্কৃত শিক্ষা ব্যতীত মাতৃভাষায় আমাদের পরিণত জ্ঞান কখনও হতে পারে না। মাতৃভাষা বাংলায় পরিণত জ্ঞানের অভাব শুধু লজ্জাজনক নয়, অপরাধ বিশেষ। যে ছেলেমেয়েরা সংস্কৃত ভাষার উপক্রমণিকা পড়েনি তারা বাংলা ভাষাচর্চার আসরে বসতেই পারে না। 'বিদ্যা' থেকে 'বিদ্যান' কেন হয় না, 'বিদ্বান' কেন হয়— একথা সংস্কৃতবোধহীন কাউকে বোঝানো যাবে? তাই বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে নয় নবম ও দশম শ্রেণিতে সংস্কৃতের প্রত্যাবর্তন প্রয়োজন। বলা হয়েছিল, সংস্কৃত নাকি বোঝা। নিজের পাড়ার মানচিত্র সম্বন্ধে যে ছেলের কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই তাকে জোর করে পড়ানো হচ্ছে দেশ বিদেশের রাজধানী বন্দরের নাম। নিজের তিন পুরুষের হিসেব পর্যন্ত যে জানে না, তাকে গেলানো হচ্ছে মুঘল সম্রাটের বংশতালিকা। এসব বোঝা কিসের জন্য? ইদানীং সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে নাকি মৌলবাদীর যোগ আছে একথা প্রকারান্তরে কেউ কেউ বলার চেষ্টা করছেন। যে কোনও ভাষা ও সাহিত্যের উপর সকলের সমান অধিকার। আর ভাষা কি কখনও কমিউনাল হয়? মার্কসীয় ভাবনাচিন্তা অনুযায়ী একটি অর্থনৈতিক ভিত্তিভূমির উপর সংস্কৃতির পরিকাঠামো নির্ভরশীল। কিন্তু ভাষা কোনও মতেই সুপার স্ট্রাকচার নয়। কোনও একটি দল বা সমষ্টিকে কমিউনাল আখ্যা দেওয়া যেতে পারে কিন্তু ভাষার মধ্যে শ্রেণিচরিত্র খোঁজা ভুল। স্ট্যালিনের 'মার্কস্‌ইজম অ্যান্ড প্রবলেমস্ অব্ লিঙ্গুইস্টিকস্' বইটি পড়লেই এই যুক্তির পরিচয় পাওয়া যাবে। তাই সংস্কৃত শব্দে 'হিন্দুত্ব' থাকে আর 'উর্দু' শব্দে ইসলাম থাকে এ ধারণা ভুল এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আজ একথাও কেউ কেউ বলতে আরম্ভ করেছেন, সংস্কৃত খুব কঠিন ভাষা। বারো বছর ব্যাকরণ পাঠ করলে তবেই সংস্কৃত শেখা যাবে। এ ধারণাও ভুল। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় আগে ভালোভাবে ভাষাটি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়, পরে আসা হয় ব্যাকরণের সাম্রাজ্যে।

আজ সংস্কৃত ব্যাকরণের ক্ষেত্রটি নিয়েও ব্যাপক চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে। ভাষাটিকে সহজ সরল করে সর্বসাধারণের নাগালের মধ্যে এনে ফেলার চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে।

সংস্কৃত ভাষা মানেই যে দাঁতভাঙা খটোমটো কিছু নয়, 'নরঃ নরৌ নরাঃ' মুখস্থ করা নয়, এ ভাষায় আধুনিক যুগের জটিল সব বিষয় প্রকাশ করা সম্ভব। ব্যাকরণ না জেনেও ব্যবহারিক কথাবার্তায় এভাষা কোনও বাধা সৃষ্টি করে না— এসব প্রচেষ্টা চলছে।

এ বিষয়ে যিনি পথ-প্রদর্শক ছিলেন তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। পরিবারের সন্তান-সন্ততিদের সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই রবীন্দ্রনাথ একটি সংস্কৃত শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ রচনার কথা দীর্ঘকাল ধরে ভেবে ছিলেন। সেজন্য ১৮৯৬ খৃস্টাব্দের ৮ আগস্ট তিনি ঠাকুরবাড়ির সংস্কৃত পণ্ডিত বাল্মীকি রামায়ণ অনুবাদক আচার্য হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের সহায়তায় দু' খণ্ডে 'সংস্কৃত শিক্ষা' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই সময়ে তাঁর বড় মেয়ে মাধুরীলতার বয়স দশ এবং বড়ছেলে রথীন্দ্রনাথের বয়স আট। পরবর্তীকালে ১৮৯৯ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদের সংস্কৃত শিক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথ পুনরায় ব্যগ্র হলেন। আর একটি সংস্কৃত শিক্ষার বই স্বয়ং রচনায় উদ্যোগী হলেন কিন্তু সেটি অর্ধসমাপ্ত রেখে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অধ্যাপক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর এটিকে বিধিমতো সমাপ্ত করবার ভার অর্পণ করেন। রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটি সম্পাদনার ভার নেন। 'সংস্কৃত প্রবেশ' গ্রন্থে ভূমিকা লেখেন রবীন্দ্রনাথ। ভূমিকাতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন— 'বয়স্কলোকের মধ্যে যাঁহারা ঘরে বসিয়া অল্পকালের মধ্যে শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত সংস্কৃত ভাষা শিখিতে ইচ্ছা করেন, এই গ্রন্থে তাঁহাদের বিশেষ উপকার হইবে আশা করিয়া ইহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম।' গোঁড়া পণ্ডিতদের ধারণা বারো বছর ব্যাকরণ পাঠ করার পর ভাষা শিক্ষার প্রস্তুতি শুরু হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ১লা আশ্বিন ১৩০১ তারিখে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে লেখা একটি চিঠিতে প্রসঙ্গক্রমে লিখেছেন— 'আপনার শ্যালক ছায়া আর্যা সরলা (সতীশরঞ্জন দাসের পত্নী সরলতা) বিদ্যার্ণবের কাছে সম্প্রতি পড়তে আরম্ভ করেছেন। শিক্ষা প্রণালীটি আমার রচিত। খুব দ্রুত উন্নতিলাভ করেছেন--- পণ্ডিতমশাই বুদ্ধিমতী ছাত্রী পেয়ে ভারী খুশীতে আছেন। আমি তাঁকে পূর্বেই আশ্বাস দিয়েছি আমার পদ্ধতিমতো যদি তিনি সংস্কৃত শেখেন তাহলে এক বৎসরের মধ্যেই তাঁর সংস্কৃত ভাষায় অধিকার জন্মাবে।'

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার রবীন্দ্রনাথকে যথোচিত শ্রদ্ধা জানালেও রবীন্দ্রনাথের প্রিয় সংস্কৃত ভাষার উন্নয়নের জন্য এখনও কিছু ঘোষণা করেননি। মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে সংস্কৃত ভাষার প্রত্যাবর্তন, টোল শিক্ষা উন্নয়ন, টোল পণ্ডিতদের বেতনক্রম এবং সামাজিক স্বীকৃতি, নবদ্বীপ ও কুচবিহারের বন্ধ হয়ে যাওয়া দুটি সরকারি সংস্কৃত কলেজ পুনরায় চালু করা এবং পশ্চিমবঙ্গে একটি সংস্কৃত আকাদেমি স্থাপনের দাবি সংস্কৃতপ্রেমী মানুষেরা সুদীর্ঘকাল ধরেই করে চলেছেন। পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় সরকার এ বিষয়গুলিতে কবে দৃষ্টিপাত করবেন সে আশায় দিন গুনছেন পণ্ডিতেরা।

সংস্কৃত-দেবতা ও মানুষের কথোপকথনের ভাষা

শ্রীশ দেওপূজারী

একটা কথা বলা যায় চরম নাস্তিকতার মধ্যেও থাকে পরম আস্তিকতা। ভারতীয়দের একটা বড় অংশ স্বভাবগতভাবে নাস্তিক হলেও তাদের অনেকেরই গভীর ঈশ্বর বিশ্বাস রয়েছে। বহুজনই স্বীকার করেন সংস্কৃত হলো দেবভাষা। অর্থাৎ দেবতার ভাষা। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ পড়তে লিখতে ও বলতে পারেন না সংস্কৃত। যাঁরা বলেন তাঁদের বেশিরভাগ যথাযথ উচ্চারণ করতে পারেন না। আমাদের ঐতিহ্যের পারম্পরিক ধারাই বলছে, সংস্কৃতের জন্ম মহেশ্বর অর্থাৎ শিবের ডমরু থেকে। মহেশ্বর সূত্রেও এমন উল্লেখ আছে। সেজন্যেই এই ভাষাকে দেবভাষা হিসেবে শ্রদ্ধা করা হয়।

বিদেশিরা এই ভাষাকে কোন্ চোখে দেখেন সেটা লক্ষ্য করার মতো। একদিন আমি দেখছিলাম 'ইউটিউব'-এর কিছু সারাংশ। এরপর পেলাম আরও তথ্য— লন্ডনের সেন্ট জেমস ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্কুলের ছাত্ররা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করছে যথাযথভাবে। যদিও বৃটিশরা দেবনাগরী লিপি পড়তে পারে না তবু সন্ধিযুক্ত শব্দ তারা সুরে এবং নির্ভুলভাবে উচ্চারণ করছিল। ব্যাপারটা অসাধারণ বৈকি। ছাত্ররা কঠোর পরিশ্রম করে ভাষাকে অনুশীলন করেছে অনেক বাধা পেরিয়ে। সে কারণেই তারা বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করতে পেরেছে— 'সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্ সংবোমনাংসি জানতাম্'। অনুষ্ঠানটা ছিল কমনওয়েলথ গেমস-এর উদ্বোধন। উদ্বোধনী আচার হিসেবে রানী এলিজাবেথ তুলে দিলেন ব্যাটন ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিলের হাতে। স্থান লন্ডনে রানীর প্রাসাদের সামনের খোলা জায়গা। সেখানেই তৈরি হয়েছিল মঞ্চ। বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের পরই ছিল নৃত্য-অনুষ্ঠান। উপনিষদ থেকে বিষয় নেওয়া হয়েছিল নাচের জন্যে। নৃত্যশিল্পীরা ছিলেন ইংরেজ। দর্শকদের মধ্যে ইংরেজ আর ভারতীয় মেশানো ছিল। আমার মতো অনেক ভারতীয়ই বিস্মিত হয়েছিলেন দুটি অনুষ্ঠান দেখে।

ইউটিউব-এর পরবর্তী অংশে দেখলাম আমেরিকা থেকে আসা একজন খৃস্টান যাজকের অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান ছিল নমস্তে বা নমস্কার নিয়ে। পরস্পরকে অভিনন্দন জানানোর সময় নমস্তে বলার ব্যাপারটাকে তিনি গুরুত্ব দেন। নমস্তে শব্দটার অর্থ ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, অন্যকে এইভাবে নমস্কারের মধ্যে রয়েছে অপরের ভিতরে থাকা আত্মাকেই প্রণাম। এটা হলো শ্রদ্ধার আন্তরিক প্রকাশ। তিনি বলতে চেয়েছেন এটা আমেরিকায় এ মুহূর্তে জরুরি প্রয়োজন। অস্থির ছাত্র ও তরুণরা এখন আগ্নেয়াস্ত্র ও আগুনের নেশায় মত্ত হয়ে সহপাঠী এবং শিক্ষকদের হত্যা করছে। এই মতিচ্ছন্নতার অসুখ থেকে তারা মুক্ত হতে পারে যদি পরস্পরকে শ্রদ্ধা করে নমস্তে জানায়।

তৃতীয় অনুষ্ঠান দেখলাম, এক বয়স্ক মানুষ শেখাচ্ছেন সকলকে কীভাবে হাত জোড় করতে হয় প্রণামমুদ্রার সময়। তিনি ব্যাখ্যা করে বোঝান এই প্রণাম মুদ্রার মধ্যে শ্রদ্ধার এমন প্রকাশ আছে যা কোনও ব্যক্তিকে নয়। শ্রদ্ধা জানানো হয় ব্যক্তিটির আত্মা বা আত্মসত্তার উদ্দেশে। আমরা যেমন সংস্কৃত ভাষায় 'নমস্তে' বলি তেমনি প্রণাম মুদ্রা করা হয় শিষ্টজনোচিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য। এর থেকে দেখা যাচ্ছে আমেরিকানরা অনুসরণ করছে ভারতীয়দের রীতিনিয়ম আচরণ। আর ভারতীয়রা অনুসরণ করছে আমেরিকানদের। আমরা দিনের শুরু করি 'গুড মর্নিং' বলে। বলি না আমাদের দেশের শব্দ 'নমস্তে'।

চতুর্থ অনুষ্ঠানটা দেখলাম, আমেরিকার গায়করা একটা বৃন্দবাদন পরিবেশন করল। নাম : 'শান্তি শান্তি'। তারা স্পষ্ট উচ্চারণে সংস্কৃত গান গাইল। এবং তারা হেঁজিপেজি নয়, জনপ্রিয় গায়ক। প্রতিবছর সংস্কৃত ভারতী আমেরিকাবাসীদের জন্যে একটা আবাসিক সংস্কৃত-শিবির আয়োজন করে। তাতে অনেক পরিবার অংশ নেয়। নাম 'জাহ্নবী'। বিভিন্ন পরিবারের নবীন প্রবীণ সদস্য যথেষ্ট

উৎসাহে যোগ দেন। শিশু ও তরুণরা মজা, খেলা, গল্প বলা এবং হাস্যকৌতুকে অংশ নেয়। আর সবকিছুর ভাষা সংস্কৃত। বয়স্ক মানুষরা বছরে একবার পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হন ওইরকম এক সুন্দর স্বাস্থ্যকর পরিবেশে। এর ফলে তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে নানারকম কথাবার্তা বলে আনন্দ পান। অবশ্যই তা সংস্কৃত ভাষায়। এরকম ভাষাজ্ঞান হলো কীভাবে? আমেরিকার ৪০টি জায়গায় সপ্তাহান্তিক সংস্কৃত প্রশিক্ষণ নিয়মিত হয়। সেখানে অনেকে সংস্কৃত শেখেন

রাজস্থানের কোটায় একটি সংস্কৃত প্রদর্শনীশালায় সংস্কৃতপ্রেমীদের সমাগম।

আগ্রহ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে। সংস্কৃতে কথোপকথন চালাতে পারেন এমন লোকজন কম নয়। প্রায় এক হাজার। আমেরিকার অন্তত ১০০টি পরিবারের মানুষ সংস্কৃত বলেন পারিবারিক স্তরে। প্রায় ৯০ জন শিক্ষক নিয়মিত সংস্কৃত শেখান সামাজিক কর্তব্য হিসেবে। সেজন্যে তাঁরা কোনও পারিশ্রমিক নেন না। এবছর এক আবাসিক শিবিরে প্রায় দুশোজন অংশগ্রহণ করে। যখন আবাসিক শিবিরের বিজ্ঞাপন বেরোয় তখন অংশগ্রহণে ইচ্ছুকদের আবেদন করার জন্যে দেখা যায় 'সংস্কৃত ভারতী'র ওয়েবসাইট ভর্তি হয়েছে আবেদনকারীর নাম ঠিকানায়। নাম তালিকাভুক্ত করার জন্যে দারুণ ভিড় হয়। নীতি থাকে একটাই— 'প্রথম এলে প্রথম সুযোগ।' আমেরিকায় সমস্ত সমাজকল্যাণসংস্থা গ্রীষ্মকালীন শিবিরের আয়োজন করে। নানারকম কাজকর্ম তাতে থাকে। তবে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা থাকে সীমিত। অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ থাকে রেলপথে স্থান সংরক্ষণের তালিকায় নামভুক্তির মতো। কয়েকজনের নাম আর এ সি-তে থাকে। কয়েকজনের থাকে ওয়েটিং লিস্টে।

আগ্রহীজনেরা ফরাসিদের দেশেও একই চিত্র দেখতে পাবেন। সেখানে ছাত্ররা আয় করে। শেখার জন্যে টাকা দেয়। সংস্কৃত শিখছেন যাঁরা তাঁদের গড় বয়স কত? নানা ধর্মের ও বিভিন্ন বয়েসের মানুষ। সংস্কৃত তাঁদের জীবিকার জন্যে প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাঁরা যথেষ্ট পরিশ্রম করছেন ওই ভাষায় দখলের জন্যে। সংস্কৃত ভাষার একজন কর্মী ও বারানস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীগোপবন্ধু মিশ্র গত দু বছর ধরে ফরাসি দেশে আছেন। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি সেখানে একটি সম্ভাষণ শিবিরের আয়োজন করেন।

সংস্কৃত ভারতী চারজনকে সংস্কৃত শিখিয়েছেন। যাঁদের মধ্যে চারজন আয়ারল্যান্ড থেকে এসেছিলেন। তাঁদের সংস্কৃত পাঠদানের উপযোগী করে তুলেছেন। সেই প্রস্তুতির মূল্য এখন মিলছে। সেই চারজন সংস্কৃত শিক্ষক একটি স্কুলে সংস্কৃত শেখাচ্ছেন। তাঁরাই প্রথম অভিভাবকদের এক সভায় ডেকে সংস্কৃতের মতো বিদেশিভাষা শেখানোকে গুরুত্ব দেন। তাঁরা আকর্ষণীয় ভাবে নিজেদের বক্তব্য পেশ করার ফলে অভিভাবকরা অভিভূত হন এবং উদ্যোগকে স্বাগত জানান। এই উদ্যোগের প্রধান মানুষটি হলেন শ্রীরুটগুড়ে। এখন তাঁকে বলা হয় মৃত্যুঞ্জয়। তিনি ছিলেন ইংরেজি ভাষার শিক্ষক। তাঁর বক্তব্য, সংস্কৃত মৌলিক বা বিশুদ্ধ ভাষা এবং পৃথিবীর অন্যতম ওইরকম ভাষা। তা ছাড়া অন্যান্য ভাষা হলো কোনও-না-কোনও মূল ভাষার অপভ্রংশ।

সংস্কৃত শেখার মধ্যে রয়েছে একটি বিশুদ্ধ ভাষা আয়ত্ত করার আনন্দ। এবং বিশুদ্ধ ভাষা দেবভাষার মাধ্যমে পরমেশ্বরের আরাধনা করা যায়।

অনেকের ঝোঁক আছে যোগ বিজ্ঞান ও আয়ুর্বেদ মূল গ্রন্থ থেকে শেখার। বিদেশিরা আন্তরিক তাগিদে ভারসাম্য রাখতে চায় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। তার মাধ্যমে স্বস্তি এবং শান্তিতে বসবাস করতে আগ্রহী। তারা পারিবারিক জীবনে হিন্দু ভাবনা আনতে চায়। সামাজিক জীবন গড়তে চায় বেদান্তকে ভিত্তি করে। কিন্তু আমরা ভারতীয়রা অন্য মেজাজে আছি। আমরা পিছনে তাকাতে চাই না নিজেদের ঠিক পথে রাখা বা আনার জন্যে। আমাদের ভাবনা আছে, জীবনদর্শন রয়েছে, অনুপ্রাণিত হওয়ার মতো জ্ঞান ও আদর্শ আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের কিছুই নেই। আমাদের সদাজাগ্রত মনোভাব উন্নত দেশগুলোর দিকে। আমরা তাকিয়ে থাকি সেদিকে। এবং ভাবি— পাশ্চাত্য আমাদের সব সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম। পশ্চিম আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে আর আমরা তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। আমাদের রয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ। কিন্তু আমরা সেদিকে তাকাচ্ছি না। সেজন্যেই হয়তো একদিন স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের চেতনাকে নাড়া দিয়ে বলেছিলেন, 'ওঠো, জাগো এবং নিজেকে বড়ো করে জানো।' এখনই সেই সময় এসেছে।

লেখক সংস্কৃত ভারতীর জাতীয় সচিব।

সূত্র : অর্গানাইজার দীপাবলী সংখ্যা ২০১১

‘মৃতভাষা’রা সত্যিই কি মৃত ?

ডি এন বেজবরুয়া

সংস্কৃত শুধু ভারতে নয় ঐভাবে প্রার্থনার ভাষা ছড়িয়ে গেছে দেশের গণ্ডী ছড়িয়ে। ভাষাকে সীমা দিয়ে আটকানো যায় না। মাধ্যম হয়েছে নানারকম প্রাকৃত ও পালি। শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া এবং এশিয়ার আরও কয়েকটি দেশে গুরুত্ব পেয়েছে সংস্কৃত। থাইল্যান্ডের অনেক ব্যক্তির নাম সংস্কৃত শব্দ থেকে নেওয়া। উচ্চারণও মূল সংস্কৃত অনুসরণে। দূর প্রাচ্যের বহু দেশে নাম নেওয়া হয়েছে মূল সংস্কৃত থেকে।

প্রশ্ন উঠেছে নানা মহলে, মৃত ভাষাগুলো সত্যিই কি মৃত? তবে এ প্রশ্ন নতুন নয়। সংস্কৃত, ল্যাটিন, প্রাচীন গ্রিক ভাষাকে অনেকেই বলে থাকেন মৃতভাষা। যদি মৃত ভাষাই হয় তাহলে এত আলোচনা কেন? আসলে কোনটাই মৃত ভাষা নয়। ভাষার ব্যবহার বা প্রয়োগ কখনও বাড়ে, কখনও কমে। সংস্কৃতের কথাই বলা যাক। যদি মৃতভাষাই হয়ে থাকে তাহলে প্রতিদিন দেশের নানা অংশে অসংখ্য মানুষ পুজোআচ্চা ওই মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে করছে কেন? কেন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রাধান্য পাচ্ছে সংস্কৃত? আসলে সব স্তরের মানুষ স্বীকার করে নিয়েছে সংস্কৃতকে ভাষা জননী হিসেবে। শুধু তাই নয় এই ভাষার চর্চাও হচ্ছে। কতরকম বই বেরোচ্ছে। প্রাচীনত্বের তিলক পাওয়া বইয়ের পুনর্মুদ্রণ হচ্ছে। সেসব বই গরম রুটির মতো বিক্রি হবে না— এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু চাহিদা না থাকলে অনেক অর্থ ব্যয়ে প্রকাশ করা কেন? আর চাহিদা যদি-বা নাও থাকে দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার তাগিদে অনেক দুষ্প্রাপ্য বই সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ করা হচ্ছে। সংস্কৃত ভাষার চর্চা চলেছে। সেজন্যে জাতীয় স্তরে খরচ হচ্ছে অনেক টাকা। বিরল প্রজাতির জীব রক্ষার জন্যে অর্থ ব্যয় হয়, সংস্কৃত মৃত বা মৃত প্রায় ভাষা বলে রাষ্ট্রীয় স্তরে এমন উদ্যোগ নয়। ভাষা চর্চার জন্যেই এভাবে সহযোগিতা এবং আন্তরিক ভাবনা।

সংস্কৃত সত্যিই জীবন্ত ভাষা। কেউ ল্যাটিন সম্পর্কেও ওইকথা বলতে পারেন। ইউরোপের অনেক প্রধান ভাষার লিপির মধ্যে মিল যথেষ্ট, দু একটা অক্ষরে শুধু অমিল। দক্ষিণ আমেরিকাকে বলা হয় প্রায়ই ল্যাটিন আমেরিকা। কারণ সেখানকার বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ ল্যাটিন থেকে জন্ম নেওয়া স্প্যানিশ ও পর্তুগীজ ভাষাকে গুরুত্ব দিয়েছে। ১৯৬৬ সালে আমি যোগ দিয়েছিলাম অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে একজন অতিথি হিসেবে। পুরো অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়েছে ল্যাটিন ভাষায়। এবং যথেষ্ট মর্যাদার সঙ্গে। সেই ভাষা ব্যবহার দেখে বুঝতে পেরেছিলাম ল্যাটিন মোটেই মৃত ভাষা নয়। আমাদের দেশে সংস্কৃত ভাষার জন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় হলেও বিশেষ মর্যাদা পায়নি।

ভারতের সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে ২২টি স্বীকৃত ভাষার মধ্যে ১৭তম ভাষা সংস্কৃত। আমাদের প্রার্থনার ভাষা সংস্কৃত। আমাদের পুজোর ভাষা সংস্কৃত। সংস্কৃত শুধু ভারতে নয় ঐভাবে প্রার্থনার ভাষা ছড়িয়ে গেছে দেশের গণ্ডী ছড়িয়ে। ভাষাকে সীমা দিয়ে আটকানো যায় না। মাধ্যম হয়েছে নানারকম প্রাকৃত ও পালি। শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া এবং এশিয়ার আরও কয়েকটি দেশে গুরুত্ব পেয়েছে সংস্কৃত। থাইল্যান্ডের অনেক ব্যক্তির নাম সংস্কৃত শব্দ থেকে নেওয়া। উচ্চারণও মূল সংস্কৃত অনুসরণে। দূর প্রাচ্যের বহু দেশে নাম নেওয়া হয়েছে মূল সংস্কৃত থেকে। নাম রাখা হয়েছে অর্থ না জেনে নয়। সংস্কৃত ভাষা থেকে নাম বেছে নেওয়ার সময় ভাবনাচিন্তা যথেষ্ট থেকেছে। ব্যাপারটা সহজে বোঝানো যাবে একটা উদাহরণ দিলে। অনেক বছর আগে থাইল্যান্ডের একটি মেয়ে পড়াশোনা করছিল হায়দরাবাদের সেন্ট্রাল ইন্সটিটিউট অফ ইংলিশ অ্যান্ড ফরেন ল্যাংগুয়েজেস- এ। তার নাম ছিল পাসানাশি। শব্দটা নেওয়া হয়েছে সংস্কৃত প্রসন্নশ্রী থেকে। কিন্তু আপনি তাকে দশবার ডেকেও সাড়া পাবেন না যদি উচ্চারণ ঠিকমতো না হয় নামের। অনেক সময় মেয়েটি ভাবত লোকে অন্য কাউকে ডাকছে কিংবা কোনও ভারতীয় ভাষায় অন্য কিছু বলছে। যদি সাড়া পেতে হয় তাহলে তার নামটি যথাযথ উচ্চারণ প্রয়োজন। তার নামের উচ্চারণে ওঠানামা আছে। ঠিকভাবে উচ্চারণ করলে সাড়া মিলবে। নামের উচ্চারণটাই আসল। আবার চীনা ভাষায় ‘মা’ উচ্চারণের মধ্যে সাতরকম অর্থ হয়। অবশ্য সবটাই নির্ভর করে উচ্চারণের তারতম্যের উপর। আর একটা মজার ব্যাপার হলো, সংস্কৃত কয়েক শতাব্দী পেরিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির গভীরে ছড়িয়ে গেছে। এমনকী বুদ্ধদেবের বাণী এশিয়ার বিভিন্ন দেশে পৌঁছে গেছে সংস্কৃতের মাধ্যমে। এরকম ভাষা বিস্তারের জন্যে সেখানে ইউরোপীয়দের মতো উপনিবেশ স্থাপন করতে হয়নি। বালিতে হিন্দু মন্দির রয়েছে এবং অত্যন্ত যত্নে তা রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে। সেখানে প্রতিদিন উচ্চারণ হচ্ছে সংস্কৃত মন্ত্র। ভারতের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক। দ্বীপময় এই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় রামায়ণও নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। এর মূলে রয়েছে সংস্কৃত ও পালির মতো ভাষা শেখা ও ব্যবহারের আগ্রহ।

(সৌজন্য : দি সেন্টিনাল, ৬ নভেম্বর ২০১১)

হাল ছেড়ো না বন্ধু

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বরং কণ্ঠ ছাড়ো জোরে। দেখা হবে **RJ** ডেন-এর সঙ্গে ৯১.৯ ফ্রেন্ডস এফ এম-এর ভোরে। এই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আমেজের মধ্যে সক্কাল সক্কাল নিদ্রা ত্যাগ করতে বলছি বলে চটে যাবেন না যেন! মনে করছেন বুঝি সাতসকালে, থুড়ি ছয়সকালে অর্থাৎ কিনা সকাল ছ'টায় ভজন কিংবা রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনাতেই এত ডাকাডাকি? না রে বাবা! ব্যাপারটা এত খেলো নয়। একে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে হলে আগে **RJ** ডেন-কে বোঝা দরকার।

RJ মানে রেডিও জকি। **RJ** ডেন তাঁর আসল নাম নয়। আসল নাম যে কি তা কোথাও ফাঁস হতে দিতে চান না। ইংরেজিতে স্নাতক। না, এতে নতুনত্ব কিছু নেই। এসব তো মামুলী ব্যাপার। অভিনবত্ব অন্য জায়গায়। আজকে বাংলা, ইংরেজি এবং হিন্দীতে যথেষ্ট সড়গড় ডেনকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে মাত্র বছর পাঁচেক আগে কথা বলতে শিখেছেন তিনি। এই রে, নেহাৎই বাচ্চা রেডিও অ্যাংকর বুঝি ভাবছেন ডেন কে? না কি ভেবে গলদঘর্ম হচ্ছেন ওইটুকু বাচ্চা ইংরেজিতে গ্র্যাজুয়েট-ই বা হলো কি করে? রহস্যটা এবার খোলসা করা যাক। আর জে ডেন জন্মের দেড় বছর পর থেকেই ডোপামিন রেসপনসিভ ডিসটোনিয়া নামের একটি জিন সংক্রান্ত রোগের শিকার। কথা তো দূরের কথা, ন্যূনতম হাঁটার ক্ষমতাটুকুও ছিল না তাঁর। হাঁটার ক্ষমতা অবশ্য আজও নেই। হুইল চেয়ারেই বহুদিন বন্দী তিনি। গত ১৪ নভেম্বর থেকে ৯১.৯ ফ্রেন্ডস এফ এম-এ শুরু হয়েছে তাঁর রেডিও অনুষ্ঠান— 'হাল ছেড়ো না বন্ধু'। অনুষ্ঠানটির চরিত্র—টক শো। অর্থাৎ এই রেডিও অনুষ্ঠানের 'কলার'রা তাঁদের যাবতীয় সমস্যা নিয়ে ফোনের মাধ্যমে সরাসরি পৌঁছে যেতে পারেন আর জে ডেন-এর দপ্তরে। তাদের সমস্যাগুলো শুনে তা সাধ্যমতো সমাধান করবেন এই রেডিও জকিটি।

ফ্রেন্ডস এফ এম-এর স্টুডিওতে RJ ডেন।

দেড় বছর বয়সে জিনের ওই রোগটির সংক্রমণ দেখা গেলেও ডাক্তাররা রোগটিকে প্রাথমিক পর্যায়ে একেবারেই চিহ্নিত করতে পারেননি। তখন থেকেই সমস্যা প্রকট হয়ে উঠতে থাকে আর জে ডেন-এর জীবনে। তারপর চলা-ফেরা একপ্রকার বন্ধ-ই হয়ে যায় তাঁর। মানসিক আঘাতে বধিরত্বের অভিশাপও এই সুযোগে আক্রমণ করে বসে তাঁকে। নিজের বাবা-মা ছাড়া আর কারুকেই সেই যন্ত্রণার বোঝা সইতে দেননি আর জে ডেন। তবে তাঁর বাবা-মা'র যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে অকস্মাৎ-ই যেন উদয় হয়েছিলেন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব্ সেরিব্রাল প্যালসী'র ডাক্তাররা। এঁদের সক্রিয় সহযোগিতা এবং বাবা-মা'র নিরলস প্রচেষ্টায় আর জে ডেন জয়ী হলেন এক অসম যুদ্ধে। আর জে ডেন-এর অনুষ্ঠানের প্রোমো দেখতে দেখতে বাবা ডঃ পবিত্র দেব মুখার্জির সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া— 'শেষের তবে শুরু হলো।'

সত্যিই অমনিশা কাটিয়ে উদ্ভাসিত আলোয় পথ চলা শুরু করলেন আর জে ডেন। ইতিমধ্যেই তাঁর টক শো বেশ জনপ্রিয় হতে শুরু করেছে রেডিও শ্রোতাদের মধ্যে। আগাগোড়া ভাল ছাত্র, কম্পিউটারে তুখোড় আর অবশ্যই অনমনীয় মানসিক দৃঢ়তার প্রতীক আর জে ডেন-কে খুঁজে পেয়ে ৯১.৯ এম এফ-এর কর্তাব্যক্তিরাও তৃপ্ত। আর জে ডেনের বক্তব্য, ''আমি নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করি, কারণ তিনবেলা অন্ততঃ খেতে তো পারছি। দেশের অনেক মানুষই যা পান না।'

এমন মানুষকেই বোধহয় শ্রোতারা তাঁদের সমস্যার কথা বলতে চান, যিনি স্রেফ জ্ঞান দেবেন না, নিজের জীবন দিয়ে জীবনের সব দুর্লঙ্ঘ্য বাধাকে অতিক্রম করার সাহস যোগাবেন। আর এখানেই শুরু হবার সঙ্গেই সুপার হিট আর জে ডেনের টক শো।

অপশাসন থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিল্লীর কুর্সির লক্ষ্যে রাজ্যভাগের কৌশল মায়াবতীর

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বিগত পাঁচ বছরে আত্মপ্রচারের তুঘলকি কাণ্ডকারখানা এবং অপশাসন থেকে জনগণের দৃষ্টি সম্পূর্ণ অন্যদিকে ঘুরিয়ে তার ফায়দা লুটতে অভিনব কৌশল নিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী। উত্তরপ্রদেশ-এর মতো বৃহৎ রাজ্য ভেঙে চারটি ক্ষুদ্র রাজ্য যথা পশ্চিমপ্রদেশ, আওয়াধ, বুন্দেলখন্ড এবং পূর্বাঞ্চল তৈরির প্রস্তাব দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী নিজের রাজ্যকে বিভক্ত করার জন্য প্রস্তাব দিচ্ছেন— এহেন দুর্লভ ঘটনা কস্মিনকালেও ঘটেছে বলে স্মরণ করতে পারছেন না প্রবীণ রাজনৈতিক মহলও। প্রশাসনিক অসুবিধে ছাড়া বড় রাজ্যকে ছোট রাজ্যে বিভক্ত করার আর কোনও কারণ থাকতে পারে বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছেন না। সেক্ষেত্রে পাঁচটি বছর রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান (অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী) পদে থেকে নিজের প্রশাসনিক গুরুত্বকে লাঘব করে রাজ্যভাগ চাইবেন না কোনও মুখ্যমন্ত্রী-ই। প্রশাসনিক অসুবিধে হলে পৌরসভা কিংবা স্থানীয় পঞ্চায়েতগুলোর সঙ্গে রাজ্যের কথাবার্তা কিংবা আলাপ-আলোচনা হোত। এক্ষেত্রে বিরোধী দলগুলোর কথা ছেড়ে দিলেও নিজের দলের মধ্যে এমনকী মন্ত্রিগোষ্ঠী'র সবার সঙ্গেও এনিয়ে মায়াবতী কোনও আলোচনা করেননি বলে সংবাদে প্রকাশ। বিরোধী দলগুলো একযোগে অভিযোগ করেছে রাজ্যভাগের ব্যাপারে মায়াবতী তাদের কারুকেই কিছু জানাবার প্রয়োজন মনে করেননি। সুতরাং প্রশাসনিক অসুবিধার অজুহাতে রাজ্য-বিভাজনের বক্তব্য তাই ধোপে টিকছে না বলেই রাজনৈতিক মহলের অভিমত।

তাই উত্তরপ্রদেশ রাজ্য-রাজনীতির অন্দরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এখন— রাজ্যবিভাজনের পথে হাঁটতে চাইছেন কেন মায়াবতীর মতো নেত্রী? তথ্যাভিজ্ঞমহলের ধারণা— প্রথমত, গত ৫ বছরে নিজের স্ট্যাচু আর মূর্তি তৈরির জন্য বিপুল পরিমাণ আর্থিক অপচয় সহ নানারকম তুঘলকি কাণ্ডকারখানা, স্বজনপোষণ, আমলাদের মধ্যে দলতন্ত্র চালু করে পার্টি ঘনিষ্ঠ আমলাদের দুর্নীতিতে মদতদান ও বিরোধী আমলাদের একঘরে থেকে শুরু করে বরখাস্ত করে দেওয়া, দলীয় মন্ত্রী ও নেতাদের আর্থিক দুর্নীতি সহ বিভিন্ন কেলেঙ্কারী, সব মিলিয়ে অপশাসনের দীর্ঘ ফিরিস্তি রয়েছে মায়াবতী'র আমলে। তার থেকে রাজ্যবাসীর দৃষ্টি ঘোরানো, তার থেকেও বড় কথা ওই প্রস্তাবিত রাজ্যগুলির অধিবাসীদের সেন্টিমেন্টকে সুড়সুড়ি দিয়ে আপামর রাজ্যবাসীর কাছেই 'হিরো' হয়ে ভোটে তার পুরো ফায়দা লোটারই পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। এ নিয়ে দ্বিতীয় যে মহাগুরুত্বপূর্ণ কারণটা রাজনৈতিক মহল মনে করছেন তা হলো— প্রধানমন্ত্রী হওয়ার নিখুঁত পরিকল্পনা নিয়েই এগোচ্ছেন মায়াবতী। উত্তরপ্রদেশের ৮০টি লোকসভা আসন-ই দিল্লীর মসনদের মূল ট্রাম্প কার্ড। সেক্ষেত্রে আঞ্চলিক সেন্টিমেন্ট ২০১৪-এ লোকসভা নির্বাচনে তুরুপের তাস হয়ে উঠতে পারে বলেই মনে করছে মায়াবতীর ঘনিষ্ঠমহল। বিগত বিধানসভা নির্বাচনে মায়াবতী'র প্রস্তাবিত ওই চার রাজ্যে তাঁর দল বহুজন সমাজপার্টির অসাধারণ ফলাফল কিন্তু বেশ কিছুটা ধাক্কা খেয়েছিল গত লোকসভা নির্বাচনে (সারণী ২, ৩, ৪, ৫ দ্রষ্টব্য)। দিল্লী'র কুর্সির দিকে লক্ষ্য রেখে এবারের বিধানসভা নির্বাচন ও তার বছর দুই পর লোকসভা নির্বাচনে আঞ্চলিক সেন্টিমেন্ট'কে সুড়সুড়ি দিয়ে হৃত ভোটব্যাঙ্ক পুনরুদ্ধারই মায়াবতী'র একমাত্র লক্ষ্য ও মোক্ষ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

সারণী-১

প্রস্তাবিত রাজ্য	জেলার সংখ্যা	লোকসভা আসন	বিধানসভা আসন
পশ্চিমপ্রদেশ	৩০	৩১	১৫০
আওয়াধ	১০	১৩	৭৩
বুন্দেলখন্ড	৭	৪	২১
পূর্বাঞ্চল	২৮	৩২	১৫৯

সারণী-২

পশ্চিমপ্রদেশে আসন-বিভাজন

দল	লোকসভা	বিধানসভা
বিএসপি	৭	৮৫
এস পি	৮	২৩
বিজেপি	৫	২২
কংগ্রেস	৫	০
আর এল ডি	৫	১০

সারণী-৩

আওয়াধে আসন-বিভাজন

দল	লোকসভা	বিধানসভা
বিএসপি	২	৩৩
এস পি	৪	২০
বিজেপি	১	৯
কংগ্রেস	৬	৭
আর এল ডি	০	০

সারণী-৪

বুন্দেলখন্ডে আসন-বিভাজন

দল	লোকসভা	বিধানসভা
বিএসপি	১	১৫
এস পি	২	৪
বিজেপি	০	০
কংগ্রেস	১	২
আর এল ডি	০	০

সারণী-৫

পূর্বাঞ্চলে আসন-বিভাজন

দল	লোকসভা	বিধানসভা
বিএসপি	১০	৮৮
এস পি	৮	৪১
বিজেপি	৪	১৭
কংগ্রেস	১০	৬
আর এল ডি	০	০

দিদির মন্ত্রিসভায় 'আমরা-ওরা' বিভাজন

মাননীয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

১৭তম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের মধ্যেই আপনাকে চিঠি লিখতে বসেছি। নন্দন আপনার পুত্রবৎ হলে এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল নিশ্চিত আপনার দ্বিতীয় কন্যা। কত আদরে তাকে ষোড়শবর্ষীয়া করেছেন। আর এখন কিনা জন্মদিনের নেমন্তন্ন পেতে হচ্ছে। সৌজন্যের নামে কি অপমানরেই না চেষ্টা বলুন! ভাষা যায় বলুন তো! এতকাল যিনি সিনেমা অনুষ্ঠানের কত্তা ছিলেন তাকেই কিনা দর্শকাসনে বসিয়ে রাখার চেষ্টা! আপনি যাননি, ভালোই করেছেন।

সে যা হোক, কাটা ঘায়ে নুনের ছিঁটে দিতে চাই না। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, এই যে মুখ্যমন্ত্রী আপনাকে ফোন করলেন আর আপনি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন সেটা কি আপনার মতো বিপ্লবী নেতাকে মানায়? গত পাঁচ মাস ধরে আপনি বলে চলেছেন, নতুন সরকারের ওপর নাকি নজর রাখছেন, সময় এলে সব বলবেন। সেটা আপনার দলীয় বিষয় কিন্তু ব্যক্তিগত একটা জবাব তো আপনিও একদিন ফোন করে জানতে চাইতে পারেন? দেখুন আপনি সেই যে বিধানসভায় 'আমরা হ্যানো, ওরা ত্যানো' বলে একটা আলটপকা মন্তব্য করলেন সেটাই তো রাজ্যের ভোটে ইস্যু হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত আপনার চৌহদ্দি হয়ে দাঁড়িয়েছে 'পাম অ্যাভিনিউ টু আলিমুদ্দিন স্ট্রিট আর আলিমুদ্দিন স্ট্রিট টু পাম অ্যাভিনিউ'। কিন্তু দিদি নিজেই যে নিজের মন্ত্রিসভার মধ্যে 'আমরা-ওরা' চালিয়ে যাচ্ছেন তার বেলা?

বুঝতে পারছেন না? বেশ, বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখুন, রাজ্যে তৃণমূল আর মূল কংগ্রেসের জোট সরকার চলছে তার মন্ত্রিসভাটাই তো একটা আস্ত 'ওরা-আমরা'। এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকারের যত ঘোষণা হয়েছে তার নব্বই শতাংশই করেছেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। আর বাকিটা দিদির খান পাঁচেক ভাই। শিক্ষায় ব্রাত্য বসু, শিল্পে পার্থ চট্টোপাধ্যায়, উত্তরবঙ্গে গৌতম দেব, ক্রীড়ায় মদন মিত্র, শ্রমে পূর্ণেন্দু বসু। না, ছ'নম্বর ভাই অমিত মিত্র এখন আবার সৎ ভাই। তিনি আর কোনও গ্রুপে নেই। অর্থ নিয়েই তো যত অনর্থ। খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক মানে দিদির বালু ভাই এই কাছের তো এই দূরের। এমনিতেই গুরুত্বপূর্ণ ন'টি দফতর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের হাতে। বাকিগুলো ঘনিষ্ঠ ভাইয়েদের হাতে। সেই ভাইয়েদের মধ্যে পূর্তমন্ত্রী সুব্রত বক্সি কদিনবাদেই সাংসদ হয়ে যাবেন। ওদিকে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এখন আবার নেক নজরে নেই। এমনকি চিরকালীন প্রথা মেনে তাঁকে কে এম ডি এ-র চেয়ারম্যান পদটাও দেওয়া হয়নি। সেখানে দিদিই প্রধান আর ডেপুটি হয়েছেন প্রাণের ভাই কানন মানে কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। এই মুহূর্তে দিদির স্নেহ পাওয়ার ব্যাপারে তাঁর ভাগ্যচক্রের নক্ষত্র-অবস্থান একেবারে তুঙ্গে।

বুদ্ধবাবু খেয়াল করুন, রাজ্যের বাকি মন্ত্রীদের নামই শোনা যায় না। জাভেদ খান, সাবিত্রী মিত্র, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রচপাল সিং, অরূপ রায়, সুদর্শন ঘোষ দস্তিদার এমনকি সুব্রত মুখোপাধ্যায় সহ বাকিদের সবার মহাকরণে ঘর আছে, দফতর, পি এ, সি এ, লালবাতির গাড়ি সব আছে কিন্তু কাজ নেই। দফতরের বাজেটও প্রায় নেই। থাকলেও টাকাই তো নেই। মাঝে কটাদিন একটু লোডশেডিং বেড়েছিল বলে মনীশ গুপ্তর নামটা আলোয় এসেছিল। বিদ্যুৎমন্ত্রী এখন আবার আঁধারে। এরা তবু সেকেন্ড ক্যাটাগরির 'আমরা কিন্তু কংগ্রেসের মন্ত্রীরা তো পুরোপুরি 'ওরা' গ্রুপের।

সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া বরাবরই প্রচার কুশলী। আপনি অবশ্য সেটা ভালোই জানেন। আপনার ক্ষমতার শেষবেলায় তো উনি কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি ছিলেন। কথায় কথায় সাংবাদিক সম্মেলন করাটা ডাক্তার মানসবাবুর চেনা ঘরানা। সেজন্য মাঝেমাঝেই এই করব, সেই করব বলে মাইক টেনে নেন। প্রচারের আলোও কিছুটা। কিন্তু ঝপ করে সে আলো নিভে যায়। মনীশ গুপ্তর লোডশেডিংয়ের মতো মানসবাবুকেও অপেক্ষায় থাকতে হবে, আবার সামনের বর্ষা পর্যন্ত। রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতি হলে তবু একটু প্রচার জোটে।

এর থেকেও খারাপ খারাপ অবস্থার মন্ত্রী আছেন। তাঁদের একজনের কথা বলি আপনাকে বুদ্ধবাবু। তিনি হলেন গিয়ে সাবিনা ইয়াসমিন। শ্রম দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী। মালদহের এই তরুণ কংগ্রেস নেত্রী ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি। তখন সংসার সামলে সভাধিপতির কাজটাও সারতে পারতেন। আর এখন মন্ত্রী হয়ে বাড়ি ছেড়ে থাকতে হচ্ছে কলকাতায়, অথচ না আছে গুরুত্ব, না আছে সম্মান। কাজের সুযোগও নেই। দফতরের যেটুকু আলো সবটাই পূর্ণমন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসুর দখলে। পূর্ণেন্দুর পূর্ণিমার পাশে সাবিনা যেন নিছকই অমাবস্যা। এই কদিনেই বিরক্ত হয়ে এক সাংবাদিককে তিনি বলে ফেলেছেন, আর পারছি না। আগেরটাই ভালো ছিল। মাঝে মাঝে মনে হয় মন্ত্রিপদ ছেড়ে দিয়ে চলে যাই।

দেখুন, বুদ্ধবাবু দেখুন। এটাকে কি আপনি 'আমরা-ওরা' বলবেন না? উনি, নিয়ম রক্ষার কিছু ফাইলপত্রে সই করেন বটে তবে সেগুলো নিছকই নিয়ম রক্ষার। তাতে উন্নয়নের কিস্যু নেই। তাঁর থেকে তাঁর অফিসার এমনকি ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের ক্ষমতাও বেশি। ভাবুন মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সাবিনা সমাজবিজ্ঞানের এম এ। তিনি মালদহ জেলার সভাধিপতির মতো সম্মান ও গুরুত্বের দায়িত্বে তিন বছর ছিলেন। অথচ তাঁর একটি পরামর্শও পূর্ণমন্ত্রীর কানে ঢোকে না। নিজের দফতরের খবর তিনি খবরের কাগজ দেখে জানতে পারেন।

খাতায় কলমে সাবিনা ইয়াসমিনের দায়িত্ব কিন্তু কম নয়। শিল্প ট্রাইব্যুনাল ও শ্রম আদালত, বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের ভাতা, কর্মরত সাংবাদিক আইন, বিড়ি ও চুরুট শ্রমিক কল্যাণ আইন, শিশু শ্রমিক ও ক্রীতদাস রোধ আইন, কর্মপ্রার্থীদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন, তথ্যমিত্র প্রকল্পের দায়িত্ব আছে। কিন্তু 'ওরা' গ্রুপের মন্ত্রী হওয়ায় তিনি পাঁচ মাসেও এক চুল কাজ করতে পারেননি।

দেখুন বুদ্ধবাবু ক্ষমতায় থাকার সময় রাজ্যের ভালো চেয়ে একটিবারও আপনি বিরোধী নেত্রীকে ফোন করেননি। কিন্তু এখন তো সত্যিই আপনি সর্বহারা। হারাবার আর কিছুই নেই। দিদিও টেলিফোনে কথা বলার রেওয়াজ দেখিয়ে দিলেন। একদিন সঙ্কোচ হারিয়ে করেই ফেলুন না একটা ফোন। না হয়, রাজ্যের স্বার্থেই জানতে চান এই 'আমরা-ওরা' বিভাজনের কারণ। ভয় পাবেন না। ফোন রিসিভ করায় পার্টি যখন ধমকায়নি, তখন কল করলেও বকবে না।

নমস্কারান্তে,
—সুন্দর মৌলিক

চিঠিপত্র

ভারত-চীন যুদ্ধ ও কম্যুনিস্টরা

স্বস্তিকা ৬৪ বর্ষ ৮ সংখ্যায় (২৪ অক্টোবর ২০১১) নিশাকর সোম 'চীনের আক্রমণ ও কম্যুনিস্ট ভূমিকা' শীর্ষক প্রবন্ধে ভারতীয় কম্যুনিস্টদের কীর্তি উদ্‌ঘাটন করেছেন। এ প্রসঙ্গে ১৯৬৭ খৃস্টাব্দে নির্বাচনের প্রাক্কালে 'দিন বদলের পালা' নামে একটি নাটক অভিনেতা উৎপল দত্ত বহু নির্বাচনী সভায় একক অভিনয়ে করেছিলেন। একটি সভায় উপস্থিত থেকে তা প্রত্যক্ষ করেছি। তখন তিনি একটি হাওয়া তুলে দিয়েছিলেন। এতে কমিউনিস্টদের বিরাট সাফল্য আসে।

তিনি ১৬/২০ খানা বই (সবই ইংরেজীতে) থেকে কয়েক লাইন করে অতি দ্রুত একের পর এক উদ্ধৃতি দিয়ে অভিনয়ের মাধ্যমে বক্তব্য রাখতেন। বিষয়— ''ম্যাকমোহন লাইন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের রচনা— ওটা মানা যায় না।'' চীন তিব্বত থেকে সিনকিয়াঙ্গ যাবার জন্য আকসাই চীনের উপর দিয়ে (অক্ষয় চিহ্ন) রাস্তা তৈরি করে ভারতের অনুমতি না নিয়ে। এরই ফলশ্রুতি— চীনের ভারত আক্রমণ। ''তারা ওই রাস্তা তৈরি করে কী অন্যায় করেছে, তার বদলে তো পূর্বপ্রান্তে (NEFA) ভারতকে জমি দিতে চেয়েছিল'' ইত্যাদি চীনাপন্থী মন্তব্যে দেশের প্রতি বিষোদগার করেছিলেন তিনি। যেমন টগর বোষ্টমীর রসগোল্লাগুলো খেয়ে কাবুলীরা মোটাসোটা রুটি হাঁড়িতে রেখেছিল (শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত দ্রষ্টব্য)। একটি লোকও এর একটা প্রতিবাদ করেনি। 'ওটা তো ঠিক' এই মনোভাবে। লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি, তৎকালীন এই পত্র লেখকও (৪৪ বছর আগে) তখনও আপত্তিকর কিছু দেখেনি স্রেফ অভিনয়ের গুণে।

—ভূপতি চরণ দে, সন্তোষপুর।

ফাঁসি নিয়ে রাজনীতি

এবার শুরু হয়েছে 'ফাঁসি' নিয়ে রাজনীতি এবং অবশ্যই ভোটের স্বার্থে আঞ্চলিকতাবাদে সুড়সুড়ি দেওয়ার রাজনীতি। ১৯৯১ সালের ২৯ মে তামিলনাড়ুর শ্রীপেরামবুদুরের এক জনসভাস্থলে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী-হত্যাকাণ্ড মামলায় শীর্ষ আদালত কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত তিন অভিযুক্ত মুরুগান, সান্থন ও পেরারিভালানের ফাঁসি মাদ্রাজ উচ্চ আদালতের এক অন্তর্বর্তী আদেশে আট সপ্তাহের জন্য স্থগিত হয়ে গেছে। ফাঁসির দিন স্থির হয়েছিল ৯ সেপ্টেম্বর। এদিকে তামিলনাড়ু বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব অনুমোদন করে রাষ্ট্রপতির কাছে তিন রাজীব হত্যাকারীর প্রাণভিক্ষার আবেদন ফের বিবেচনার জন্য জানানো হয় অনুরোধ। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে ওই তিন ঘাতকের ক্ষমাভিক্ষার আর্জি খারিজ করে দিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি।

আসলে ওই তিন ঘাতক জেলে রয়েছে ২০ বছর। কারণ তাদের প্রাণভিক্ষার আবেদনের নিষ্পত্তি হতে সময়ই লেগেছে ১১ বছর। যেমন এদেশের 'আঠারো মাসের বছর'-এর সরকার, তেমনি রাষ্ট্রপতির অফিসও। আর এই ঘটনার পর ট্যুইটারে মুখ খুলেছেন জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। তিনি বলেছেন, ''তামিলনাড়ুর বিধানসভার ধাঁচে যদি জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভাতেও আফজল গুরুকে নিয়ে একটি ঐক্যমতের প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহলে কী এমন সাড়াশব্দহীন প্রতিক্রিয়া হোত? আমার তো মনে হয় না।'' আবদুল্লার ওই মন্তব্য যে বিজেপি-কে উদ্দেশ্য করে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বিজেপি যথারীতি ওমরের বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছে। তারা ওই বক্তব্যকে দুঃখজনক, দুর্ভাগ্যজনক, দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে মন্তব্য করেছে। কোনও কোনও রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞের ধারণা, ওমরের মুখ খোলার পিছনে রয়েছে কংগ্রেসের উস্কানি। কারণ সংসদ হামলার মূল পাণ্ডা আফজল গুরু শীর্ষ আদালতের রায়ে মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত এক আসামী। সেও দীর্ঘদিন রয়েছে জেলে। কংগ্রেস তথা ইউ পি এ সরকার তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে অহেতুক করছে বিলম্ব। উদ্দেশ্য আফজলকে রেহাই দেওয়া। রাজীব ঘাতকদের বাঁচাতে তামিলনাড়ু সরকার ও বিরোধীরা যেভাবে এগিয়ে এসেছেন সেভাবেই এগিয়ে আসতে চাইছেন ওমর। তাঁকে দিয়ে কংগ্রেস চাইছে জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় অনুরূপ একটা প্রস্তাব পাশ করাতে যেখানে কংগ্রেসের কোনও মুখ্য ভূমিকা থাকবে না। কংগ্রেস নেবে লোক দেখানো 'নিরপেক্ষ' ভূমিকা। অথচ তাতে 'সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না'। আফজল কারাদণ্ড ভোগ করবে, কিন্তু ফাঁসি হবে না।

—ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

সুপার হিরো মুডে নরেন্দ্র মোদী

গোধরা পরবর্তী দাঙ্গায় গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে দাঙ্গায় ইন্‌একশন বা মদত দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল মূলতঃ কংগ্রেস এম. পি. এহমান জাফরীর মৃত্যুকে ঘিরে। কংগ্রেস দল, কিছু তথাকথিত সেকুলার মহল, বামপন্থী দল ও তিস্তা শীতলবাদদের দাপাদাপিতে গুজরাতের মামলা প্রধান আদালতের তত্ত্বাবধানে, সিটের তদন্তের পর্যালোচনা করার পর প্রধান আদালত সেই গুজরাতেই ফার্স্ট ট্রাক কোর্টে মামলাটিকে স্থানান্তরিত করেন ১২ সেপ্টেম্বর।

এত তদন্ত করেও প্রধান আদালত নরেন্দ্র মোদী ও তার অফিসারদের বিরুদ্ধে কোনও দোষারোপ করলেন না কেন? তাই মোদী, অরুণ জেটলি, সুষমা স্বরাজদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বলে দিচ্ছে নরেন্দ্র মোদী নির্দোষ। কংগ্রেস, বামপন্থী, শীতলবাদরা মুখরক্ষার জন্য বলছে কোর্ট মোদীকে কোনও ক্লিন চিট দেয়নি। এই ক্লিন চিট কথাটা কংগ্রেসী চিটিংবাদরা মুখে বলে। যারা নিজেরাই অপরাধী '৮৪-র দাঙ্গায় হাজার দুই শিখদের হত্যা করে। এদেরই পুলিশের কাছ থেকে ক্লিন চিট দরকার হয়। এটা বুঝতে কোনও অ্যাডভোকেট হতে হয় না যে এত কাণ্ড করে, তদন্ত করেও মোদীর বিরুদ্ধে কোনও স্পষ্ট প্রমাণ (hard evidence) পাওয়া যায়নি যাতে প্রধান আদালত কাউকে দোষী সাব্যস্ত করবে। তাই প্রধান আদালত বলেছে, অভিযোগকারিনীকে জিজ্ঞেস করতে যে আর কোন hard evidence আছে কিনা। ইচ্ছা করলে নিম্ন আদালত এই মামলা বন্ধ করেও দিতে পারে। তবে প্রধান আদালত এই মামলায় আর মনিটারিং করবে না। এবার দেখা যাক মার্কিন থিঙ্ক ট্যাঙ্ক সি আর এম কি বলেছে— যে দেশ ২০০৫ সালে মোদীকে ভিসা দেয়নি সেই দেশের বড় কর্তারা বলেছেন, 'Mr. Narendra Modi Proved, he is a key driver of national economic growth.

এবার কংগ্রেসের তথাকথিত 'ভাবী প্রধানমন্ত্রী'র সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর তুলনা করতে গিয়ে তারা কি বলেছে দেখা যাক— Rahul has uneasy style and reputation for gaffes. Rahul dogged by questions about his ability to lead party.

কংগ্রেসের নতুন কীর্তি ঘুষ দিয়ে ভোট কেনা। অতীতে নরসিমা রাও শিবু সোরেনের দলকে কোটি টাকা ঘুষ দিয়ে সরকার গঠন করেছিল। মনমোহন সিং সেই সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। আর এবার মনমোহনের সরকারও ঘুষ দিয়ে সরকার রক্ষা করে রেকর্ড করেছে। বেচারা অমর সিং ফেঁসে গিয়ে জেল খাটছেন। কিন্তু ওই ঘুষ কাণ্ডে লাভবান হয়েছিল কংগ্রেস। তাহলে দিল্লীর বেহায়া অকর্মণ্য পুলিশ কংগ্রেসের মাথাগুলিকে প্রশ্ন বা জেরা করছে না কেন?

—বৈদ্যনাথ ঘোষ, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা।

হিন্দু অর্থনীতি

নীতীন রায়

নিউইয়র্কের মাটিতে একটি ঘটনা ঘটেছে। নিউইয়র্ক শহরে বহু আমেরিকান একত্রিত হয়ে একটি বিষয়ে প্রতিবাদ করেছেন। বিষয় হলো আমেরিকার ৯০ শতাংশ সম্পদ ১ শতাংশ মানুষ উপভোগ করছে। ৯৯ শতাংশ মানুষের পক্ষে তাই এই প্রতিবাদ। ৭০০ আমেরিকান নাগরিক গ্রেপ্তার বরণ করেছেন। হাজার চেষ্টা ও হাজার নীতিমালা তৈরি করেও সম্পদের Progressive distribution বা যথাযথ বন্টন সম্ভব হয়নি। প্রায় দুই শত বৎসরের সম্পদ জড়ো হয়েছে কতিপয় ব্যক্তির হাতে। তারা উদ্যোগপতি বা শিল্পপতি।

আমেরিকা বা ইউরোপের অর্থনৈতিক অবস্থা কয়েকটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়। যেমন— (1) Organising (2) Monetary Control (3) Market economy (4) Job Creation ও (6) Consumerism। সংগঠন করেন সেই ব্যক্তি যাঁর সাংগঠনিক মেধা আছে। একটি সমাজে এঁদের সংখ্যা খুব কম। মুক্ত অর্থনৈতিক অবস্থানে এঁদের জ্ঞান ও বুদ্ধিকে কাজে লাগানো হয়। এঁরা উদ্যোগপতি হিসাবে পরিচিত হন। অর্থনীতির জীবন কাঠি এদের হাতে থাকে। এঁরা সেই সুযোগে সম্পদ সংগ্রহ করে তাকে উৎপাদনমুখী করেন।

এঁরা বিনিয়োগপতি ও শিল্পপতি নামেও পরিচিত। বিকাশশীল দেশে এঁদের জন্য আইন বদলে যায়। Distribution of Wealth কথার কথা হয়ে দাঁড়ায়। ইউরোপ আবার এর বিপরীতেও চিন্তা করেছে অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি যা সমস্ত পৃথিবীতে এখন পরিত্যাজ্য হচ্ছে। মুক্ত অর্থনীতিতে ব্যক্তি-উদ্যোগকে স্বীকার করা হয় এবং সেই পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়।

আবার সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করা হয়। সরকারই অর্থনীতির নিয়ন্তা দুই অর্থ ব্যবস্থাতেই। রাষ্ট্রই মুখ্য। তাই অর্থনীতি শুধুমাত্র অর্থনীতি থাকে না, পরিবর্তিত হয় Political Economy-তে। আবার তার পরিবর্তন হয় প্রয়োজন অনুসারে এবং উদ্যোগপতির স্বার্থকেই বড় করে দেখা হয়। নিঃশুল্ক-বিদ্যুৎ থেকে নিঃশুল্ক-বাজারী ব্যবস্থাও তাদের উপহার দেওয়া হয়। শুধুমাত্র অজুহাত Job creation।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। নেহেরু মেম-সাহেবদের সঙ্গে চলাফেরা করে একটা জিনিসই ভারতবাসীকে শিখিয়েছেন— আমাদের ইউরোপীয় হতে হবে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে দেশকে বিব্রত করেছেন। লাইসেন্স-রাজ সৃষ্টি হয়েছে, কিছু মানুষ সম্পদ লুটেছেন, আমজনতার কোনও উপকারে লাগেনি সমাজতান্ত্রিক আর্থ-বটিকার। আবার বাজার অর্থনীতির সুবাদে কিছু লোকই সম্পদ সংগ্রহ করেছে। Parity of Income বা আয়ের সামঞ্জস্য সুদূর পরাহত। ২০ শতাংশ মানুষ বিলো প্রভার্টি লাইনের (বিপিএল) উপরে। ১০ কোটি মানুষের আয় সমগ্র ইউরোপবাসির আয়ের চেয়ে বেশি। সম্পদ কিছু লোকের হাতে জমা হয়েছে। অনিল আম্বানি বাড়ি করেছেন ৪০০০ কোটি টাকা খরচ করে। শচিন তেন্ডুলকার ৭৮ কোটি টাকা খরচ করে বাড়ি করেছেন। ওই সম্পদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আমজনতাকে উপহাস করছে অর্থনৈতিক নীতিমালা।

পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক তত্ত্ব ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রচিত। ভোগবাদ বা Consumerisam এর ফলে ক্রেডিট কার্ড-এর উপস্থিতি। ঋণ করে খরচ করো। সঞ্চয় নৈব নৈব চ। আমজনতাকে উপদেশ— 'ঋণং কৃত্বাঃ ঘৃতং পিবেত।' চার্বাক ঋষিদের কথা যেন বলছে ইউরোপ। আর এই নীতির নীট ফল জনতার হাত থেকে সম্পদ বিনিয়োগকারিদের হাতে চলে গেছে। আমজনতার ঋণের বোঝা নিয়ে তার দিন কাটছে। ৯৯ শতাংশ সম্পদ ১ শতাংশ মানুষের হাতে উঠিয়ে দিয়েছে রাষ্ট্রযন্ত্র।

আমাদের মুনি ঋষিরা এক হিন্দু অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া দিয়ে গেছেন। যাকে সামাজিক অর্থনীতি নামে অভিহিত করা যেতে পারে। শৈশবে আমরা খেলা করতাম বাড়ির বাইরের উঠোনে। অনেক মুসলমান কৃষক পূজাপার্বণের তারিখ জানতে চাইতো। আমরা মার কাছে থেকে তারিখ জেনে এসে বলতাম। আসলে এই কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য ওই তারিখে বিক্রি করতে চাইতো বেশি দাম পাবার আশায়। পূজা আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করবার ছাড়পত্র দেয় ঠিকই। কিন্তু অন্যদিকে গড়ে তুলেছে এক বিকল্প সামাজিক অর্থনীতি। পুজোয় চাহিদা সৃষ্টি হয়। শুধু জামা কাপড়ে এই চাহিদা সৃষ্টি হয় তা নয়, খাবারদাবার, ফুল, শিল্পকর্ম, পুস্তক, ফল, কৃষিপণ্য, প্যান্ডেল, ঢাকীর প্রভৃতির চাহিদা বেড়ে যায়। যারা কোনওদিন অর্থনীতির ছোঁওয়া পায় না তারাও উপকৃত হয়। ওই বিশাল চাহিদা শিল্প কারখানার চাকা ঘুরোতে সমর্থ। তাই সারা বিশ্বে মন্দা হওয়া সত্ত্বেও ভারতে চাহিদা স্বাভাবিক রয়ে গেছে। অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়েনি। সমাজের প্রত্যেক স্তরের মানুষ তার ক্ষমতা অনুযায়ী চাহিদা সৃষ্টি করে পুজোকে কেন্দ্র করে।

সারা ভারতবর্ষে যে প্যান্ডেল তৈরি হয় তাতে লক্ষ লক্ষ কর্মদিবস সৃষ্টি হয়। আবার ফুলের অভ্যন্তরীণ চাহিদাকে ঘিরে চাষাবাদের মাধ্যমে রফতানি হচ্ছে। তাতে বহু লোকের কর্মসংস্থান হয়। অন্নপ্রাশন ও হিন্দু বিবাহকে ঘিরে বিশাল অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া রয়েছে। লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকা জড়িত। প্রতিটি মন্দির ঘিরে বহু লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে। সবই সামাজিক উদ্যোগ।

পাশ্চাত্য থেকে উদ্ভূত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শুধুমাত্র Political Economy বা রাজনৈতিক অর্থনীতি। কিন্তু আমাদের ঋষিরা যে অর্থনীতি গড়ে তুলেছেন তা Social Economy (সামাজিক অর্থনীতি)। হিন্দুসমাজ তার ধর্মীয় ও সামাজিক পদ্ধতির গুণে এই Social Economy-কে সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করতে পেরেছেন। বিশাল অর্থনৈতিক কাণ্ড হওয়া সত্ত্বেও উদ্যোগপতি শিল্পপতিদের আনোগোনা নেই।

এই অর্থনীতি, সমাজের সর্বস্তরে আনন্দের বার্তা নিয়ে যায়। আবার সমাজের সর্বস্তরের বিশাল সংখ্যক মানুষের কাছে পূজা ও হিন্দু সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো আয়ের কারণ। উৎপাদনকারিরা তাদের দ্রব্য বিক্রি করতে পারে। সমস্ত প্রক্রিয়ায় সম্পদের বন্টন ব্যবস্থা জড়িত। সম্পূর্ণ না হলেও বিরাটাকারে এই ব্যবস্থায় সম্পদের বন্টন সম্ভব।

ভারতীয় সাংস্কৃতিক সংহতিতে আধ্যাত্মিক জীবনের অবদান

স্বামী দেবনারায়ণ পুরীজী মহারাজ

ভারতমাতার বাস্তবিক রূপ দর্শন করে ভারতবাসী মুগ্ধ হয়েছিল। এইজন্য তারা ব্যর্থ চিন্তা না করে জীবনের মহামুক্তির জন্য সংগঠিত হয়েছিল। আজও ভারতবাসী তাই করে থাকেন। নানা প্রকার বৈষম্য থাকলেও একতার ক্ষেত্রে একটুও আঁচ পড়তে দিচ্ছিল না, এখনও দিতে চায় না। আজ ভারতবর্ষে ৮০ শতাংশ হিন্দু আছে, এছাড়াও ভারতের বাইরের নানান দেশে বসবাস করা হিন্দুর সংখ্যাও কম নয়। জীবনের প্রত্যেক ধর্মে কর্মে তাঁরা যে মন্ত্রের উচ্চারণ করে থাকেন, সেগুলি সর্বত্রই এক। সপ্তপদীগমনের মন্ত্র, যা বিবাহোত্তর জীবনের জন্য সঙ্কল্প তা আজও অবিকৃত, শ্রাদ্ধের মন্ত্রেও কোনও পরিবর্তন কোথাও নাই। সত্যনারায়ণ ব্রতকারীগণ সেই এক কলাবতী আখ্যান (সত্যনারায়ণের পাঁচালি) শ্রদ্ধা সহ শ্রবণ করেন। সেই উত্তরপূর্বাঞ্চলের আদিবাসী-বনবাসীগণ তীর্থদর্শন মানসে সেই দক্ষিণের রামেশ্বরম্— কন্যাকুমারী থেকে আরম্ভ করে সুদূর উত্তরের দুর্গম বৈষ্ণোদেবী, অমরনাথ, কেদার-বদ্রী দর্শন করতে যায়। প্রকৃতপক্ষে আমরা যেখানেই বাস করি না কেন, আমরা সবাই ভারতমাতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

আমরা জাতীয় সংহতি, সাংস্কৃতিক সংহতি প্রভৃতি বলার সময় সংহতির স্বরূপ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পোষণ করি না। যখন বাঁ হাতে মশা কামড়ায় (দংশন করে) তখন কি ডান হাঁত চেঁচিয়ে বলে— 'আরে তোকে মশা কামড়াচ্ছে, দাঁড়া দেখাচ্ছি মজাটা। না কি বাঁ হাতই সাহায্যের জন্য চেঁচামেচি করে? কিন্তু আমরা দেখি— তৎক্ষণাৎ চুপচাপ ডান হাত উঠে গিয়ে মশার উপর আঘাত করে। এমন জাতীয়তা বোধকেই সংহতির সংজ্ঞা দেওয়া যায়। ভারতের অখণ্ডতার উপর, সংস্কৃতি ও ধর্মের উপর যখন যখনই বিপত্তি এসেছে অথবা আসে, সেই সময় তার রক্ষার জন্য ভারতমাতার বলিবেদিতে কে কতটা বলিদান দিতে পেরেছে বা পারবে, তা দেখেই আমাদের জাতীয় সংহতির মূল্যায়ন হয়েছে এবং হবে।

আপনারা হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন যে, ধর্মের সম্পর্কে বলা হয়েছে, সেই ধর্মের স্বরূপ কি সকল যুগে একই ছিল? আজ আমরা ধর্মের যে স্বরূপ দেখতে পাচ্ছি, সেইটিই কি ধর্মের চিরন্তন রূপ। আমি বলব— এমন কথা নয়, সনাতন বললে যদিও অধিকারীকেই বুঝা যায় তথাপি যুগে যুগে এর বাহ্যরূপের পরিবর্তন ঘটে থাকে। এটা অস্বীকার করা যায় না। তবে একটা কথায় নজর দেওয়া দরকার যে, বৈদিক যুগে কর্মকাণ্ডের উপর অত্যধিক মহত্ত্ব দেওয়া হয়েছিল। বড় বড় যজ্ঞ হচ্ছিল, ভগবান অগ্নিমুখ ছিলেন এবং আমাদের শ্রদ্ধার্পিত দ্রব্যগ্রহণ করতেন। যজ্ঞে আহুতি দান করেই সর্বপ্রকার ধর্মকর্ম সম্পন্ন হচ্ছিল। আজও তো আমরা তাই করি। দুর্গাপূজায় হোম হয়, জন্মাষ্টমীতেও হোমের প্রথা আছে। গৃহপ্রবেশ আদি শুভকর্মে হোম করা আমাদের ধর্মানুষ্ঠানের মুখ্য কর্তব্য রূপে এখনও পরিগণিত। প্রথমাবস্থায় কেবল যজ্ঞই হচ্ছিল, কোনও বহিরঙ্গ ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে অন্যান্য অঙ্গের প্রাধান্য বাড়তে লাগল। কেন বাড়তে লাগল?

যখনই জনসমাজ জ্ঞানালোকের দ্বারা আলোকিত হতে লাগল, তখন শুধু আচার-অনুষ্ঠানে সন্তুষ্ট না থেকে তত্ত্বচিন্তার প্রতি আগ্রহী হতে থাকল। শিক্ষিত সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি জ্ঞানপিপাসু অর্থাৎ ভারতী সরস্বতী তথা ব্রহ্মবিদ্যার উপাসক। তবেই তো এদেশের নাম ভারত এবং এদেশের জনগণকে ভারতী বলা হয়। অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাব যে, বৈদিক যুগের (দৃশদ্বতী) সরস্বতী নদীর তীরে বসে আত্মচিন্তনে নিমগ্ন, শিক্ষার প্রকাশে উদ্ভাসিত মননশীল ব্যক্তিগণ সেই সময় কেবল কর্মাবর্ততেই মগ্ন না থেকে সৃষ্টির উৎপত্তির কারণ সম্পর্কীয় অনুসন্ধানেও ব্যস্ত ছিলেন। ঘটের অপাদান কারণ মাটি, নিমিত্তকারণ কুমার, কুলালচক্র ইত্যাদি। কিন্তু, এই জগতের উপাদান কারণ কি? নিমিত্ত কারণেই বা কি?

'কিং কারণং ব্রহ্ম, কুতঃ স্ম জাতা,
জীবাম কেন ক্বচ সম্প্রতিষ্ঠাঃ।
অধিষ্ঠাতাঃ কেন সুখেতরেষু, বর্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্।।'

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ—১।১।।

ব্রহ্মবাদীগণ পরস্পর জিজ্ঞাসা করেছেন—'হে ব্রহ্মবাদীগণ, জগতের কারণ কি ব্রহ্ম? কোথা থেকে আমাদের উৎপত্তি হলো? কিসের দ্বারা আমরা জীবিত আছি? অন্তকালে কোথায় থাকব? আমাদের সুখ দুঃখের ব্যবস্থা পরিচালনা কার অধীন?'

এই অনুসন্ধানের পরাকাষ্ঠায় প্রাপ্ত নিজের অনুভবকে বিশ্ববাসীর মধ্যে তাঁরা বিতরণ করলেন। 'কৃন্বন্তু বিশ্বমার্যম্' ভাবনা নিয়ে 'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' বলে

আহ্বান করে বললেন—

'বেদাহম্ এতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যত্যেয়নায়।।'

স্বপ্রকাশ এবং জ্ঞানাতীত এই সর্বব্যাপী পুরুষকে আমি জানি। তাঁকে জানলে পরেই সংসারের জীবগণ মৃত্যুকে জয় করতে পারে, এছাড়া অন্য কোনও পথ নাই।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ গবেষণা করে সংসারে প্রচলিত ধর্মমতের উৎপত্তি কাল সম্পর্কে নির্ণয় করেছেন। ঋগ্বেদের প্রাচীনতা সম্পর্কে তাঁরা সকলেই একমত। আমরা তো বেদকে অনাদি মেনে থাকি, ওরা না হয় অনাদি না মেনে সর্বপ্রাচীন মানল। এর থেকে একটি পরিষ্কার কথা বুঝা গেল যে, যখন বিশ্বমানব সেই 'আদিম গুহামানব' রূপে জীবন ব্যতীত করেছিল, তখন ভারতের ভোগবিরত হয়ে ব্রহ্মজ্ঞানের চরম শিখরে পৌঁছে গেছিলেন। তারা আত্ম বিজ্ঞানে শক্তিশালী হয়েই ক্ষান্ত ছিল না, তাই দিব্য আলোকের দ্বারা বিশ্ববাসীকে আলোকিত করবার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

এই হলো প্রাচীন ভারতের কর্মচিন্তার রূপ। ভারতবাসীর মধ্যে এই জ্ঞানালোকের বিতরণ করেছিলেন ঋষিকুল। কেবল এখানেই সন্তুষ্ট না থেকে ভারতের বাইরেও পা রেখেছিলেন তারা। ঋষি জমদগ্নি হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে পশ্চিম দিকে চলে গেছিলেন এবং অগস্ত্যঋষি গেছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। প্রখ্যাত 'অগস্ত্যযাত্রা' এবং অগস্ত্য ঋষির সমুদ্র পানের কথা সর্বজনবিদিত। ভাদ্র মাসের পয়লা তারিখ অগস্ত্য ঋষি মধ্যভারতে থাকা অলঙ্ঘ্য বিন্ধ্যপর্বত পার করে যেই দাক্ষিণাত্যের দিকে চলে গেলেন আর ফিরে এলেন না। অন্ধ শ্রদ্ধালুগণ এই ভয়ে কিনা এদিন বেরুলে আর ফিরে আসবেনা, পয়লা ভাদ্রতে ঘরের বাইরে পা রাখে না। সমুদ্রের জলপাল করা অসম্ভব কথা। সেকালের দাক্ষিণাত্যে জ্ঞানালোক বিতরণ করার পর পারাবারহীন সমুদ্রকেও পরোয়া না করে চলে গিয়েছিলেন ইন্দোনেশিয়ায়। ওখানে আজও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাওয়া যায়। সেই নয়, সুদূর দক্ষিণ আমেরিকা পযন্ত ভারতীয় সংস্কৃতির জ্ঞানালোক বিতরণ হয়েছিল।

পরবর্তী কালখণ্ডে বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রচারার্থ কোনও উল্লেখনীয় ব্যক্তি সেই সেই দেশগুলিতে না যাওয়ার দরুন সেখানে আজ বৈদিক হিন্দু ধর্ম নেই বটে, কিন্তু হিন্দু সংস্কৃতির নিদর্শন লুপ্ত হয়ে যায়নি। ঋষিগণ যেভাবে স্বধর্মপ্রচারের নিজ কর্তব্য এবং দায়িত্ব পালন করেছিল, আজ আমরা তা থেকে বিমুখ হয়ে গেছি। সে কালের জনমানস সত্যধর্ম ও বিদ্যার প্রকাশে উদ্ভাষিত ছিল, সেজন্য আত্মতত্ত্বই সেকালের আধ্যাত্মিক জীবনের উপজীব্য ছিল।

ইদানীং পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে আমরা এতই বিকল যে, স্বদেশের, স্বধর্মের, স্বসংস্কৃতির অখণ্ডতা, অবিচ্ছিন্নতা রক্ষণের প্রতি একেবারে উদাসীন। ভোগবাদের করাল গ্রাসে গ্রসিত জনসাধারণের কথা ছেড়েই দিলাম, ধর্মরক্ষক এবং সমাজরক্ষক তথা দেশ রক্ষকগণও ভোগবাদে গ্রস্ত। সেজন্যই একতা, সমরসতা, সহানুভূতিত্ব ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। এই সমস্তকে ফিরিয়ে এনে মানুষের মধ্যে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত না করতে পারলে জাতীয় ও সাংস্কৃতিক সংহতিকে অখণ্ড রাখা যাবে না। তাই এ বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে যাওয়া কর্তব্যই শুধু নয়, অবশ্য কর্তব্য।

একদিন দার্জিলিঙে

হিতেন্দ্র কুমার ঘোষ

বেড়ানোটা মানুষের প্রায় সহজাত প্রবৃত্তি। আদিমকালে মানুষ যাযাবরের মতো এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়াতো। সেটা মূলতঃ তাদের খাদ্য সামগ্রীর অন্বেষণে। এক সময় যানবাহনের অসুবিধার জন্য আমাদের দেশের কত মানুষ দল বেঁধে পায়ে হেঁটে কত তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করেছেন!

ভ্রমণ একটা নেশাই বলা চলে। বাড়িতে দেখবেন বিকেল হলেই ছোট্ট শিশুরা ঘরের বাইরে যাবার জন্য ছটফট করে! তারা হয়তো কথা বলতেও শেখেনি। তবুও তাদের ঘরের বাইরে যেতে মন চায়, দু'চোখ ভরে নীল আকাশ, পশু, পাখী, মানুষজন, গাড়িঘোড়া দেখে আনন্দ পায়।

১৯৫৫ সাল। এপ্রিল মাস। স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ। আমরা মালদহ শহরের আটজন স্বয়ংসেবক (আর এস এসের) অহীন্দ্র কুমার দে'র (জয়দেবদা) নেতৃত্বে ভোর পাঁচটায় সাইকেলে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

তখন ৩৪নং জাতীয় সড়কে কেবল কাজ শুরু হয়েছে। কোথাও খোয়া বা পাথরের টুকরো পড়েছে, কোথাও বা মাটি কাটা হয়েছে, কোথাও বা পিচের কাজ আরম্ভ হয়েছে। সেই সময় বেলা ১০টার পরে আর সাইকেল চালানো যেত না। একে তো প্রচণ্ড সূর্যের তাপ, তার উপরে আবার আগুনের হল্কার মতো লু বইতো। তাই ভোরবেলা থেকে সকাল সাড়ে ন'টা পর্যন্ত সাইকেল চালাতাম। পথের ধারে কোনও পুকুর বা ডোবা দেখে সেখানে আহারাদি-বিশ্রাম। প্রত্যেকের সঙ্গেই ছিল চিড়ে, মুড়ি, ছোলা এবং যবের ছাতু, গুড় ও একটা করে বড় বাটি। তখনও রাস্তার ধারে বসতি বা দোকানপাট গড়ে ওঠেনি। আবার বিকেল সাড়ে চারটে থেকে রাত্রি সাড়ে নটা পর্যন্ত সাইকেল চালাতাম। পূর্ণিমা রাত। পথে এমনি কোনও কষ্ট হয়নি। দূরে সাঁওতাল গ্রাম থেকে ভেসে আসা বাঁশি এবং মাদলের বাজনার শব্দ যেন আমাদের সকলকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে ফেলতো।

পথে দু'জায়গায় রাত্রিবাস। রায়গঞ্জ এবং ঈশ্বরপুরে (ইসলামপুর আলুয়াবাড়ী স্টেশনে)। তৃতীয় দিনে বিকেলে শিলিগুড়ি। তখন বংশীদা (সঙ্ঘের বরিষ্ঠ প্রচারক কিছুদিন আগে প্রয়াত বংশীলাল সোনী) দার্জিলিং জেলা প্রচারক। মহাবীর স্থানে একটি ধর্মশালায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। বিকেলে শাখাতে

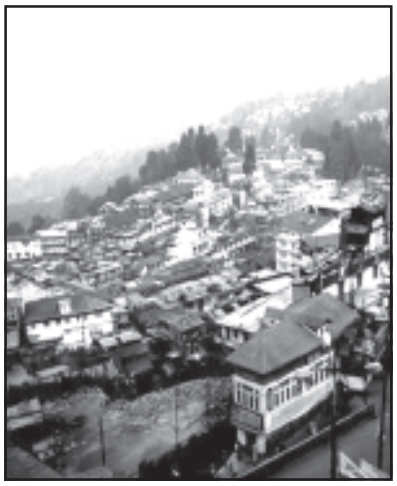

(আর এস এসের) গেলাম। জগদীশ চন্দ্র আগরওয়াল ছিলেন মুখ্য শিক্ষক। শিলিগুড়ি শাখার সঙ্গে হা-ডু-ডু খেললাম, বংশীদা খেললেন শিলিগুড়ি পক্ষে। সেদিন খেলার সময় বংশীদা'কে দেখালেন স্পট জাম করে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে কিভাবে বোকা বানাতে হয়।

পরের দিন ভোরবেলায় পায়ে হাঁটা পথ ধরে কার্শিয়াং গেলাম। কী দুর্গম পথ। পাহাড়ের গায়ে ধরার কিছু নাই। বাঁ-দিক ফাঁকা। পাদদেশ শুধু নীল। তাকালেই যেন মাথা ঘুরে যাচ্ছে। কার্শিয়াং-এ পৌঁছে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। আর পাহাড়ের দুর্গম রাস্তা নয়। সকলে কোরাস গান গেয়ে চলেছি (পা করে মস্‌মস্, বাম-ডান মস্ মস্; সব চেয়ে ভালো পা গাড়ী, গাড়ীতে চড়িনা, যায় তাড়াতাড়ি; ট্রামে বাসে চড়িনা, বড় ঝকমারী)। পথে সোনাদা হিন্দু মিশনের স্বামীজী দুপুরবেলায় ভাত খাইয়েছিলেন। বিকেলে পটাটো রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরিদর্শক শ্রীদিল্লীশ্বর মুখার্জী মশাই আমাদের চা পানে আপ্যায়িত করেন। আমরা তাঁকে বলেছিলাম, আপনার এমনই নাম যে জীবনে ভুলবো না! তারপর আবার যাত্রা শুরু। ঘুম থেকে দার্জিলিং যাবার সময় পথে একটি বাঁক থেকে দার্জিলিং শহর দেখা গেল। সন্ধ্যেবেলা, মনে হচ্ছে শহরে যেন দীপাবলী উৎসব পালিত হচ্ছে। পাহাড়ের থাকে থাকে ঘর-বাড়ির প্রজ্বলিত আলো দেখে তাই মনে হয়েছিল সেদিন। ওই দৃশ্য দেখে আমরা সকলেই মুগ্ধ। পথের যত কষ্ট ক্লান্তি পেয়েছি সবই যেন আজ সার্থক।

দার্জিলিং শহরে সর্বত্র হেঁটে হেঁটেই ঘুরে বেড়ালাম। দুপুরবেলায় ঘরের মেঝেতে শুয়ে বিশ্রাম করছি, এমন সময় প্রচণ্ড বৃষ্টি। ঠাণ্ডায় বৃষ্টির জল রাস্তায় জমে বরফ হয়ে গেছে। রাস্তায় ছোট ছোট ছেলেরা বরফের গোলা বানিয়ে সকলে লোফালুফি করে যেন বল খেলছে। আর আমরা ঠাণ্ডায় ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছি। আমাদের কারুরই শীতের পোষাক ছিল না। তখন রামদার বুদ্ধিতে ঘরের মধ্যে সতরঞ্জি বিছিয়ে ঘণ্টাখানেক হা-ডু-ডু খেলে শরীর গরম করা হলো!

সেদিন রাত ১২টা নাগাদ গায়ে কম্বল জড়িয়ে, হাতে দণ্ড নিয়ে সবাই টাইগার হিলের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। ভোর ৪টে নাগাদ টাইগার হিলে পৌঁছোলাম। তখন সোজা ঘুম থেকে টাইগার হিলে ওঠা যেত না এবং কোনও গাড়ীও উঠতে পারতো না। প্রচণ্ড খাড়াই পথ, তাই সামনের দিকে ঝুঁকে উঠতে হোত। এখনও তো রাস্তার অনেক মাটি কাটা হয়েছে। ফলে, গাড়ী ঘোড়া সোজা টাইগার হিলে উঠতে পারছে। ভ্রমণার্থীদেরও আর কষ্ট করতে হয় না। যাইহোক, টাইগার হিলে সূর্যোদয়ের মনোরম দৃশ্য— যেন একটা আগুনের গোলা আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠে আসছে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য, ভাষায় ব্যক্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মনে হলো এবারের ভ্রমণে যত কষ্টই পেয়ে থাকিনা কেন, আমাদের দার্জিলিং ভ্রমণ সত্যিই সার্থক।

তাই বলছি টাকা পয়সা কিছুই ভ্রমণের প্রতিবন্ধক হতে পারে না। চাই ভ্রমণের মানসিকতা। ছোটবেলা থেকে সঙ্ঘের একদিনের ট্রিপ বা তিনদিনের শীতকালীন শিবিরই আমার মনে ভ্রমণের নেশা জায়গায়।

শান্তির প্রতীক তিন অসামান্যা

ইন্দিরা রায়

বাঙালি তথা হিন্দুদের কাছে শক্তিপুজো মানেই নারীর আরাধনা। নারীর মধ্যেই নিহিত দেবীত্ব— তিন মিলিত শক্তির মূর্ত প্রতীক— কখনও দুর্গা, কখনও কালী, কখনও জগদ্ধাত্রী।

এবার সারা বিশ্বজুড়েই প্রতিফলিত হয়েছে বাস্তব জগতে এর সত্যতা। আন্তর্জাতিক স্তরে এক সুখকর সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছে। সেটি হলো— শান্তি নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত তিন নারী, তাঁরা— লাইবেরিয়ার

জনসন সিরলিফ

তাওয়াক্কুল কারমান

দু'জন— প্রেসিডেন্ট জনসন সিরলিফ, নারী অধিকার কর্মী লিমা গবউই আর তৃতীয় জন ইয়েমেনের তাওয়াক্কুল কারমান। তিনজনের প্রতিবাদ লড়াই-এর বিষয়— অধিকার, সুরক্ষা আর বদল।

নারী মানেই সংসারের লক্ষ্মী। তিনি চান সংসারে শান্তির বাতাবরণ। শান্তি আকাঙ্ক্ষিণী নারী যখন দেশের ও সমাজের দায়িত্বভার বহন করেন; তখনও তাঁর লক্ষ্য থাকে সমাজ বা দেশে শান্তি বজায় রাখা। কোনও অশান্তকর ঘটনার প্রতিবাদ করতেও বর্তমান নারীরা পেছপা হন না। রীতিমতো রুখে দাঁড়ান এর বিরুদ্ধে। যে তিনজন বিদেশিনী নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিতা হলেন, তাঁরাও শান্তি আনয়নের পক্ষেই লড়াই করেছেন। নারী অধিকারের লড়াইকে স্বীকৃতি দিল নরওয়ের নোবেল কমিটি। এবারে এঁদের কার্যাবলী সম্পর্কে আলাদা করে জেনে নেওয়া থাক। প্রথমেই আমরা লাইবেরিয়ার পরিস্থিতিটা দেখে নিই। পশ্চিম আফ্রিকার দেশ লাইবেরিয়া। একসময় সভ্যতার গরবে অহঙ্কারী সাহেবসুবোরা গোটা আফ্রিকাকে কালাআদমীর দেশ, অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশ বলে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখতেন। সেই কারণেই আফ্রিকার লাইবেরিয়া 'অন্ধকারাচ্ছন্ন' দেশ। ফলে সেখানে চলছে শুধুই দুর্নীতি। ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে শুরু করে সবরকম দুর্নীতি— যার পরিণতি গৃহযুদ্ধ পর্যন্ত গড়ায়। অত্যন্ত দরিদ্র এই দেশ। এই দেশের ৮৫ শতাংশ মানুষই দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী। সেখান না আছে খাদ্য, না আছে বস্ত্র। শিক্ষা তো দূরের কথা। পেটের দায়ে শিশু একটু বড় হলেই সেনানীর খাতায় নাম লেখায়। শিক্ষার অভাবে নারীদের ওপর যৌন অত্যাচার চলে অবিরত। নারীবাদী সিরলিফ এবং নারী অধিকারের কর্মী লিমা যখন সামনের সারিতে আসেন, তখন দেশরক্ষক ছিলেন যুদ্ধপ্রিয় প্রেসিডেন্ট চার্লস টেলর। এমনই এক অস্থির সময় জনসন সিরলিফ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফেরেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের লাইবেরিয়া বিশ্বব্যাঙ্কের শাখায় যোগদান করেন। তখন থেকেই যুদ্ধবাজ টেলরের অপশাসনের বিরুদ্ধে চলে সুস্থ প্রশাসনের লড়াই। রাজনীতির আঙিনায় শেষপর্যন্ত '৯৭-তে ভোটে দাঁড়ান সিরলিফ। স্বভাবতই অন্যায়ের ঝোড়ো হাওয়ায় ন্যায়ের স্তম্ভ চুরমার হয়। কিন্তু ন্যায়ের স্তম্ভ নড়ে গেলেও ভেঙে যায়নি। সিরলিফ দুর্নীতি ও একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলেন। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেন এবং তাঁর বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে তাঁকে 'লৌহমানবী' আখ্যা দেন। শেষপর্যন্ত স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সিরলিফ ২০০৫-এ বিপুলসংখ্যক ভোটে জিতে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন।

নারী অধিকারকর্মী লিমা গবউই। তাঁর মূল লড়াই ছিল নারীর অধিকার রক্ষার এবং ধর্ষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর। টেলরের অপশাসনের ধর্ষণের রাজনীতির বিরুদ্ধে তিনি শ'য়ে শ'য়ে মহিলাদের জড়ো করেছিলেন প্রতিবাদী হিসেবে। তিনি নিজে ঘরণী। ঘর করেন পাঁচটি সন্তান নিয়ে। এমনই এক গৃহকর্ত্রী দেশনেত্রী হিসেবে লড়াই-এ নেমে পড়েন প্রকাশ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে। এঁরা দু'জনেই প্রতিবাদী হয়ে ওঠার প্রেরণা পান ২০০৪-এর শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত কেনিয়ার ওয়াঙ্গেরি মাথাই-এর কাছে, যিনি সম্প্রতি লোকান্তরিত হয়েছেন। উল্লেখ্য, লিমা তাঁর দুঃসাহসিক কাজের জন্য ২০০৯-এ 'প্রোফাইল ইন কারেজ অ্যাওয়ার্ড' পুরস্কারে পুরস্কৃত হন।

আরব দুনিয়ার ইয়েমেনের আরেক ব্যতিক্রমী মহিলা তাওয়াক্কুল কারমান, যিনি পেশায় সাংবাদিক। আরেকদিকে ঘোরতর সংসারী। ইয়েমেনে তিনি একটি মানবাধিকার সংগঠন চালান মহিলা সাংবাদিকদের নিয়ে। প্রথমদিকে তিনি ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট আলি আবদুল্লা সালেকে ক্ষমতাচ্যুত করতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। তিনি ইসনা পার্টিরও সদস্য। আরবদেশের বিভিন্ন জায়গার ঘরবন্দী মহিলাদের তিনি জাগিয়ে তুলছেন। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাদের সচেতন করছেন। স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার। শান্তির আহ্বান জানানোর জন্যই তাঁর নোবেল শান্তি পুরস্কার অবশ্যই প্রাপ্য। তিনি স্বীকার করছেন— আজ তাঁর এই জয় বা পুরস্কার আরবদেশে গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থানকারীদের প্রতি উৎসর্গিত। তারাও এখন স্বৈরতন্ত্র নয়, গণতন্ত্র চাইছে।

সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মহিলারা সমাজে নিজেদের স্থান, অধিকার স্থাপন করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। আজ নারী-পুরুষে কোনও ভেদাভেদ নেই। সুতরাং নোবেল শান্তি পুরস্কার নারীদেরও প্রাপ্য। এ বছরে নোবেল কমিটি বিশ্বের দরবারে স্বৈরতন্ত্র, অন্ধকারাচ্ছন্ন সংরক্ষণশীল দেশে শান্তি, নারী অধিকার অর্জনে। সমর্থ কৃতী মহিলাত্রয়ীকে নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রদান করে সারা বিশ্বে আলোড়ন তুলেছেন এবং পরবর্তী মহিলাদের উদ্বুদ্ধ করে তুলেছেন এমনই অসামান্য কাজে এগিয়ে আসতে।

সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হলো আজ পুরুষের পাশাপাশি মহিলারাও সমান মর্যাদা পাবার অধিকারিণী।

ভারত-পাক সম্পর্কে কন্ডোলিজার বক্তব্য নিয়ে উন্মাদনা নিরর্থক

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

মালদ্বীপে অনুষ্ঠিত সার্ক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রী রেহেমান মালিক বলেছেন, ২৬ নভেম্বর ২০০৮-এর মুম্বাই হামলায়— একমাত্র জীবিত আততায়ী হিসেবে আজমল কাসভের ফাঁসি হওয়া উচিত। ইতিমধ্যে ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন-কানুন অনুযায়ী নৃশংস অপরাধী কাসভ কিন্তু ভারতের আদালতে সমস্ত রকমের আইনী সহায়তা পেয়েছে। বিচার পর্ব দীর্ঘদিন ধরে চলেছে। অথচ অসংখ্য নিরীহ মানুষজন ও আইনের রক্ষকদের নির্বিচারে হত্যা করার অপরাধে আদালত নির্ধারিত প্রাণদণ্ডের প্রাপ্য সাজাটি তাকে দিতে ভারত সরকার গভীরভাবে ভোটের হিসাব-নিকাশে মগ্ন। রাষ্ট্রপতির কাছে কাসভের প্রাণভিক্ষার আবেদন অপেক্ষমান ঠিক যেমন অনাদি অপেক্ষায় শায়িত কুখ্যাত সংসদ আক্রমণের চক্রান্তকারী আজমল গুরুর আবেদন। এক্ষেত্রেও অকর্মণ্য সরকার একই হিসাব পরীক্ষায় নিরত। দেশের সংখ্যালঘু ভোটদাতারা না জানি কিভাবে!

এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ২০০৮-এর নভেম্বর মাস থেকে তাবৎ ঘটনাবলীতে পাকিস্তান তার জড়িত থাকার বিষয়টি আদ্যন্ত অস্বীকার করে এসেছে। কাসভের ডি এন এ পরীক্ষা থেকে শুরু করে তার পাকিস্তানী নাগরিকত্ব, সাবালকত্ব অস্বীকারের পর্বগুলি বিচার প্রক্রিয়া ও শাস্তিদানের বিষয়টিকে বিলম্বিত করতে পাকিস্তান যত রকমের অপকৌশল প্রয়োগ করা যায় সবই করেছে। দীর্ঘ তিন বছর পরে আজকে তাদের মন্ত্রীই এই ঘৃণ্য অপরাধের চক্রান্তকে স্বীকৃতি দিলেন। ভারত বিরোধিতায় তাদের মিথ্যাচার যে মানবিকতার কোন সীমা লঙ্ঘন করতে পারে তা আজ নির্লজ্জভাবে প্রকাশিত হলো।

কাকতালীয়ভাবে উল্লেখিত মিথ্যাপর্বের জাজ্বল্যমান প্রমাণ হিসেবে গত ২৯ অক্টোবর

২০১১ তারিখে ভূতপূর্ব মার্কিন সেক্রেটারী অফ স্টেট শ্রীমতী কন্ডোলিজা রাইসের প্রকাশিতব্য আত্মজীবনী 'No Higher Honour' বইটির কিছু উদ্ধৃতি বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। স্বভাবসিদ্ধভাবে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানী মুম্বাই আক্রমণের ক্ষেত্রে সেদিন পাকিস্তানের কোনও ভূমিকা নেই বলায়— কন্ডোলিজা সরাসরি তাঁকে বলেন, ''মাননীয় প্রধানমন্ত্রী' হয় আপনি নির্ঘাত মিথ্যা বলছেন নয়তো আপনার শাকরেদরা আপনাকে মিথ্যা বোঝাচ্ছে (Mr. PM either you are lying to me or your people are lying to you...)। আমরা এই আক্রমণের উৎসস্থল সম্বন্ধে সবই অবগত আছি।" ২৬/১১-র আক্রমণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তৎকালীন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের নির্দেশেই কন্ডোলিজা পাকিস্তানে গিয়ে তাদের নেতৃত্বকে বলেন, সারা পৃথিবীই জেনে গেছে যে আক্রমণকারীরা পাকিস্তান থেকেই ভারতে গিয়েছিল। কথাটা শুনে প্রেসিডেন্ট জারদারি হতচকিত হয়ে পড়েন এবং সম্ভাব্য যুদ্ধের সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়লেও পাকিস্তানের ভূমিকা সম্বন্ধে যথারীতি অস্বীকারের কৌশলেই স্থির থাকেন। সেই কারণে রেহেমান মালিকের আজকের এই পশ্চাদ্‌গমন একটি গোটা জাতির মিথ্যাচারেরই নির্লজ্জ উন্মোচন। তবে এখানে বলার— পাকিস্তানের ভারতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী কি তা নিশ্চিতভাবে জানার জন্য 'আমেরিকান ডিপ্লোম্যাটে'র তথ্যের জন্য যদি অপেক্ষা করতে হয় তা নিশ্চিত পরিতাপের বিষয়। কেননা বিখ্যাত পদাধিকারীদের এই আত্মজীবনী আর তাঁদের কর্মজীবনের ইতিহাস লেখার চল ব্যাপক। আমেরিকানদের মধ্যে তো তা প্রায় সংক্রামক। অবশ্যই এর মধ্যে তাঁদের চরিত্রের কৃষ্ণবর্ণদিক -গুলি কতটা আলোকিত হয়েছে তা নিয়ে খুব হইচই হয় না। বিল ক্লিন্টন তাঁর 'Hope and History' বইতে মণিকা লিউনস্কীর সঙ্গে তাঁর কুখ্যাত 'White House' পর্বটি কেমন চালিয়ে ছিলেন তার বিশদ কিছু পাওয়া যায় না। রিপাবলিকান রোনাল্ড রিগ্যান (1981-1989) তাঁর—'An American Life'-এ গর্বাচভের প্রথম আমেরিকা ভ্রমণের সময়কার আতঙ্ক ব্যক্ত করলেও তাঁর উচ্ছৃঙ্খল চলচ্চিত্র জীবন সম্পর্কে কি বলেছেন তা হয়তো খুব পরিষ্কার নয়। কিম্বা আদ্যন্ত নারীবিলাসী সংক্ষিপ্ততম সময়ের আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি তাঁর 'Profiles in Courage' গ্রন্থে তাঁর USA Marine হিসেবে সাহসী সৈনিক জীবন ও রাষ্ট্রপ্রধানের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেও কালো আমেরিকান মার্টিন লুথার কিং-এর উত্তাল আন্দোলন বা খুন হয়ে যাওয়া নিয়ে কতটা আন্তরিক ছিলেন তাও হয়ত অপরিজ্ঞাতই থাকে। আজকাল Google, Amazon ইত্যাদির দৌলতে সকলেই উপরিউক্ত

ব্যাপারগুলির সম্পর্কে অবগত হতেই পারেন। সব পড়তে লাগে না, শুধু জানারটুকুই জানতে দেওয়া হয়।

কন্ডোলিজা যদিও সরকারি পদাধিকারী হিসেবেই ভারত ও পাকিস্তান উভয়দেশে এসেছিলেন, তাঁর বয়ানটিকে তাই সরকারি বলে ধরা যেতেই পারে। তা সত্ত্বেও যে ফাঁক থাকবে না এমন নাও হতে পারে। সাক্ষ্য হিসেবে সাম্প্রতিক একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনার সরকারি প্রতিবেদন ও অনতিবিলম্ব পরে এক ভূতপূর্ব আমেরিকান সামরিক কমান্ডারের বিবরণে কি আকাশপাতাল তফাত ধরা পড়ে, একটু দেখা যাক। হ্যাঁ, আর কেউ নয়, স্বয়ং ওসামা বিন লাদেনকে পাকিস্তানের আবেটোবাদে তার ডেরায় গিয়ে মারতে ৪৫ মিনিটের বন্দুক যুদ্ধ করতে হয়, এমনটাই সরকারিভাবে পৃথিবীকে জানানো হয়েছিল। সম্প্রতি অভিজাত USA Navy Seal Teams Six -এর ভূতপূর্ব Commander ঘটনাস্থল আবোটাবাদের বহু প্রত্যক্ষদর্শী ও অভিযানের সঙ্গে সরাসরি জড়িত এমন বহু মানুষের সাক্ষাৎকার নেওয়ার পর তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত বইতে জানিয়েছেন— আল কায়দা প্রধানকে মারতে সেদিন লেগেছিল মাত্র ৯০ সেকেন্ড— ঘোষিত ৪৫ মিনিটের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আদৌ নয়। শুধু তাই নয়, লেখক Chuck Ptarret আমেরিকান সরকারি বয়ানকে নস্যাৎ করে জানিয়েছেন যে লাদেনের বাড়ির ছাদেই Block Hawle Helicopter নেমেছিল। নিচে থেকে লড়াই করে কম্যান্ডোরা ওপরে ওঠেনি। পালাবার সময় একটি হেলিকপ্টার Crash করে যায়, লাদেনের ডেরায় নামার আগে নয়।

এত বিশদ আলোচনার কারণ এই যে চিরাচরিতভাবে বিদেশীদের মুখে মান্যতা পেলে তবেই ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের দিক নির্দেশ পাওয়া যাবে বা পাকিস্তানের আগ্রাসী চরিত্রের নিশ্চয়তা সন্দেহাতীত হবে এসব বাতুলতা মাত্র। সত্যি বলতে কী, হয়ত গর্ভস্থ ভারত সন্তানও মাতার চিন্তাস্রোতের বাহক হয়ে সঠিক তথ্য জানে। তাই পাকিস্তানকে বিচার করতে স্বাধীনতার উন্মেষলগ্নে কাশ্মীর আক্রমণ থেকে আতঙ্কবাদীর নিরবচ্ছিন্ন চাষ, ৬৫ ও ৯৯-এর কার্গিল যুদ্ধ, তাদের মদতে সংসদ আক্রমণ ও নিরন্তর মৌখিক শত্রুতার ঘৃণ্য সংস্কৃতিটিই পর্যাপ্ত। কন্ডোলিজা রাইস নিয়ে উন্মাদনা নিরর্থক।

ধুবুলিয়ায় নোয়াখালি দিবস পালন

'পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়'— শিরোনামে এক স্মৃতিধর্মী অনুষ্ঠান হয়ে গেল নোয়াখালির 'রায়সাহেব' রাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরীর উত্তরপুরুষ শিবাশিস রায়চৌধুরীর নদীয়া জেলার ধুবুলিয়ায় দেশবন্ধু নগরের নিজ বাসভবন নৈবেদ্য-এ। ১৯৪৬ সালের ১১ অক্টোবর কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন দেশভাগ অর্থাৎ পাকিস্তান আদায়ের জন্য নোয়াখালির করপাড়ার জমিদারিতে মুসলিম লিগের গোলাম সারোয়ারের নেতৃত্বে যে দাঙ্গা হয়েছিল তাতে সেই রায়সাহেবের জমিদারির পতন সহ

পরিবারের ২২ জন লোক নিহত হয়েছিলেন এবং অসংখ্য হিন্দু আহত ও অপহৃত হয়েছিল।

এবারও ওই একই দিনে সেই ৬৫ বছর আগের দিনটিকে স্মরণ করে সকাল ১০টায় ৬৫টি মোমবাতি প্রজ্বলনের পরে, মাঙ্গলিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে সেই দিনের সেই সব বিদেহী আত্মার প্রতি শান্তি কামনা করা হয়। পরে, এক স্মৃতিধর্মী আলোচনায় উঠে আসে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের স্বাধীনতার দিনক্ষণ যদি তড়িঘড়ি ১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এ নির্ধারণ না করতেন এবং যদি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এ্যাটলি তথা বৃটিশ পার্লামেন্ট নির্ধারিত জুন, ১৯৪৮-এ দেশ স্বাধীন হোত তবে অন্তত দেশভাগ তথা 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তানের' জন্য রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা এড়ানো যেত।

অনুষ্ঠানে আলোচিত হয়, নোয়াখালির চৌধুরী পরিবারের সুসন্তান প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী যখন ইসলামিক ইতিহাসে অনলস গবেষণায় রত থেকে একের পর এক ঐতিহাসিক গ্রন্থ— Din-i-ilahi; Music in Islam; State and Religion in Mughal India; Influence of Indian Culture on Arabic Literature; Egypt in 45; Romance of Afganisthan, বিশ্বে প্রথম আরবি ভাষায় 'শ্রীমদ্‌ভাগবতগীতা'র অনুবাদ প্রভৃতি রচনা করে চলেছেন, সেই বাড়িরই অপরজনেরা নোয়াখালিতে একে একে পাকিস্তানের রাজনৈতিক দাবীর কারণে মৌলবাদের খড়গতলে প্রাণ দিচ্ছে। শেষে, মুসলিম লিগের পাকিস্তানের রাজনৈতিক দাবীতে গান্ধীজীসহ কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির শীলমোহর পড়লে হিন্দু বাঙালির ভবিষ্যতের জন্য 'হোমল্যান্ড' পশ্চিমবাংলা'র দাবিতে ডঃ শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আন্দোলনের সাথী ছিলেন ডঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী। ১৫ মার্চ ১৯৪৭-এ কলকাতা সম্মেলনে যেখানে এই হোমল্যান্ডের প্রস্তাব গৃহীত হয়, সেখানে ডঃ রায়চৌধুরীসহ উপস্থিত ছিলেন ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ভাষাবিদ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। পরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সেই আন্দোলন ও প্রবল জনমতের চাপে এই হোমল্যান্ডের প্রস্তাব ডঃ বিধানচন্দ্র রায়, কিরণশঙ্কর রায় প্রমুখের মধ্যস্থতায় মানতে বাধ্য হয়। যার ফলশ্রুতিই আজকে আমাদের রাজ্য— পশ্চিমবঙ্গ।

থানায় হানা

কুকুরকে লাই দিয়ে মাথায় তোলা হয়েছে

শিবাজী গুপ্ত

কোনও এক সম্প্রদায়ভুক্ত গুণ্ডাদের হাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুলিশকে নাস্তানাবুদ হতে হচ্ছে নিয়মিতভাবে। এই সম্প্রদায়ের গুণ্ডাদের এবং তাদের স্বধর্মীদের হাতে পুলিশের নিগ্রহ এখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। গুণ্ডাদের ধরতে গেলে কয়েক মিনিটের মধ্যে হাজার হাজার লোক জড়ো হয়ে পুলিশকে ঘিরে ধরে, অপরাধীদের ধরার কাজে বাধা দেয় কিংবা ধরা পড়া গুণ্ডাকে ছিনিয়ে নেয়। যদিও বা কোনপ্রকারে থানায় এনে তোলা যায়, সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে-বুড়ো-মদ্দ সব এসে থানা ঘেরাও করে মসজিদের মাইকে আল্লাকে না ডেকে মোল্লাদের থানা ঘেরাও করতে ডাক দেয়। গুণ্ডাদের কোর্টে তুলতে যাওয়ার পথেও কেড়ে নিয়ে চম্পট দেয়। বা পুলিশের গাড়ি থেকে ছিনতাই করে চম্পট দেয়। পুলিশ-দারোগা, উকিল-মোক্তার-জজ- পেশকার ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। পুলিশকে মারধর তো জলভাত।

সম্প্রতি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কুলপি ও ক্যানিং-এর নিকটবর্তী নবগঠিত জীবনতলা থানায় পার্শ্ববর্তী গ্রামের মুসলমান জনতা হাজারে হাজারে এসে থানার কাগজপত্র আসবাবপত্র তছনছ লণ্ডভণ্ড করেছে এবং পরে পুলিশ কোয়ার্টার্সে গিয়ে লুটপাট, ভাঙচুর মহিলাদের হেনস্থা করতেও পেছপা হয়নি। এমনকী বড়বাবুর গিন্নীরও হাত ধরে টানাটানি করেছে। গুণ্ডারা ও তাদের সমর্থক মুসলমান জনতা সব অপকর্ম সমাপ্ত করে শান্তিপূর্ণভাবে প্রস্থান করেছে। একটা গুণ্ডারও গায়ে আঁচড় লাগেনি জেনে মুখ্যমন্ত্রী সমেত শাসক দলের নেতারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন! তারপর যথারীতি শান্তি কমিটি হলো। পঞ্চায়েত সদস্যরা এলেন, অঞ্চল প্রধান এলেন, জেলা সভাধিপতি এলেন, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এলেন, রাজনৈতিক দলের নেতারা এলেন এবং এঁরা সবই মুসলমান। তাঁরা শান্তি কমিটি করলেন, শান্তি বজায় রাখার আবেদন করলেন। কিন্তু যারা অশান্তি সৃষ্টি করল পুলিশ ও হিন্দু জনতার উপর নির্যাতন, ও লুঠপাট চালাল, সেই মুসলমান গুণ্ডা ও তাদের রক্ষকদের কেশও ছিঁড়তে পারল না। পারবে কেমন করে? অত্যাচারিত হিন্দুরা হলো এদের কাছে গো-মাংস তুল্য, তাদের উপর অত্যাচারের বিচার ইসলাম বিরোধী। আর অত্যাচারী মুসলমানরা তাদের কাছে শূয়োর গোস্ত তুল্য। সুতরাং তাদের বিচার করা না-পাক হারাম। মুসলমান হয়ে মুসলমানের অন্যায়ের বিচার করলে ইসলাম যে জাহান্নামে যাবে। তাই শান্তি কমিটির ন্যাকামোপনা।

১৯৪৬ সালের কলকাতা ও নোয়াখালি দাঙ্গা থেকেই এই শান্তি কমিটির ভড়ং শুরু হয়েছিল। দু'জায়গাতেই অত্যাচারিত হিন্দুরা শান্তি কমিটির শিকার হয়েছেন। নোয়াখালিতে যে ইউনিয়ন বোর্ডের মুসলমান প্রেসিডেন্টরা ছিলেন; দাঙ্গার নায়ক ও পরিচালক তারাই শান্তি -কমিটির সভাপতির পদ দখল করে বসলেন। সুতরাং রেডক্রশের রিলিফ বন্টনের ভার পেলেন। যেমন :

''খেয়া পার হচ্ছি, সঙ্গের দু'একজন ফিশফিশ করে চিনিয়ে দিচ্ছেন নৌকার মাঝিকে— হাতে যার রেডক্রশের ব্যাজ, লোকটা দাঙ্গায় নেতৃত্ব দিয়েছিল অমুক গ্রামে।'' (অশোকা গুপ্তা— নোয়াখালির দুর্যোগের দিনে)

১৯৪৬ সালের কলকাতা-নোয়াখালির দাঙ্গায় অত্যাচারিত হিন্দুদের রক্ষার্থে দাঙ্গার নায়ক সুরাবর্দীর পুলিশ যেমন একটি বুলেটের খরচ করেনি, কুলপি, জীবনতলা থানার পুলিশও নিজেদের স্ত্রী-কন্যার ইজ্জত রক্ষার্থে পিস্তল- বন্দুকে হাত দেয়নি কিংবা থানা অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র নিয়ে গুণ্ডাবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের জন্মের শিক্ষা দিতে সাহস পায়নি। কারণ তা হলেই চাকরিটি নট হয়ে যাবে। হিন্দু পুলিশ হয়ে মুসলমান গুণ্ডার গায়ে হাত! এতো বড় দুঃসাহস! জানো না, হিন্দু মেয়েকে ফুসলিয়ে নিয়ে শেষে তাল সামলাতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে বলেই না তার জন্য কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে আমরা একটা রাজ্য দখল করে ফেললাম! এখন তাদের গায়ে হাত দিয়ে আমরা গদি খোয়াব নাকি? আমাদের বুঝেসুজে চলতে হবে। ওদের যতদূর সম্ভব আস্কারা দিতে হবে। হিন্দুদের উপর অত্যাচার নিয়ে মস্করা করা চলবে না। ভোটে হেরে বেইজ্জতির চেয়ে মা-বোনের ইজ্জতের দাম বেশি হলো নাকি! যাদের দোয়ায় করে খাচ্ছ, তাদের উপর যেন চিল— কাউয়া না ওড়ে সেদিকে খেয়াল রেখো।

নেতা-নেত্রীর ভাবসাব বোঝা গেল। আর বোঝা গেল হিন্দুর শত্রু হিন্দু। সারা দেশ জয়চন্দ্রে ভরে গেছে। এদেশের অতীতের পুরু, পৃথ্বীরাজ এদেশে আর জন্মাবেন না; এ যুগের সাভারকর-শ্যামাপ্রসাদেরও আর আবির্ভাব হবে না। বাঘ-সিংহের গর্জন শোনা যাবে না; শোনা যাবে খেঁকশিয়ালের হুক্কাহুয়া। বিবেকানন্দের স্থান গ্রহণ করেছে মদনানন্দের দল। গান্ধী মহারাজ ভারতীয় হিন্দুদের ধমনীতে যে অহিংসা এবং নির্জীবতার বিষ ঢুকিয়ে গেছেন, তার প্রভাবে হিন্দুদের মান-মর্যাদাবোধ, ধর্মা-ধর্মবোধ, ন্যায়-অন্যায়বোধ কাপুরুষত্ব-পৌরুষত্ববোধ সব হারিয়ে গেছে। পৌরাণিক চরিত্র পরশুরাম নাকি একশো বার ভারতভূমিকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন, তারপরেও যেটুকু বাকী ছিল 'হে রাম' এসে সেটুকুও বিনষ্ট করে গেছেন। এখন ভারতে ৭০/৮০ কোটি হেলে বা কেঁচো আছে; কিন্তু একটাও কেউটে বা গোখরো নেই। সুতরাং জাতিদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী ও দেশদ্রোহীদের রাম রাজত্ব চলবে না তো কি? তবে হে রামের জায়গায় হারাম বলাই সঠিক।

একে সরকারি কর্মচারী, তার উপর পুলিশ। এদের গায়ে হাত তোলার কথা কেউ কখনও ভাবতে পেরেছে কি? বাঘে ছুঁলে আধার ঘা তো পুলিশে ছুঁলে ছাবিশ ঘা। আর সে পুলিশ নীরবে অপমান সহ্য করার পুলিশ নয়— ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করার পুলিশ। কিন্তু কংগ্রেস শাসনের পর থেকে পুলিশের পায়ে বেড়ি পরানো হয়েছে। যে সমাজে ধর্মীয় প্রচ্ছায়ায় গুণ্ডা উৎপাদনের প্রচুর ব্যবস্থা রয়েছে সে সমাজ-ই এখন রাইটার্স দখলের হাতিয়ার হয়েছে। সুতরাং গুণ্ডার দল 'দাদা যুগ যুগ জিও' ছেড়ে, 'দিদি যুগ যুগ জিও' ধ্বনি তুলেছে। ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, মাদ্রাসা, হজ হাউসের গম্বুজ, গোরস্থানের উন্নতি, চাকরিতে সংরক্ষণ কিছুই তাদের কাছে অলভ্য নয়। চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি, ছিনতাই, অবাধে মাদক পাচার, মেয়ে বেচার অধিকার, হিন্দু মেয়েদের শ্লীলতাহানি, হিন্দু মন্দির ধ্বংস, মূর্তি ভাঙা, শোভাযাত্রায় হামলা, নোট জালিয়াতি ইত্যাদি সবরকম অপকর্মেই সমাজ শত্রুদের অবাধ লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। ভেড়ুয়া হিন্দুরা সংখ্যালঘু তকমালাগা গুণ্ডাদের সহজ শিকারে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এভাবে আর কতদিন হিন্দুরা মুখ বুজে থাকবে?

‘স্মোকিন জো’ ছিলেন পুরুষকারের আদর্শ প্রতিভূ

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনের চেয়েও বড় পুরুষাকারের বলিষ্ঠ উদাহরণ ছিলেন তিনি। মৃত্যুতেও রয়ে গেলেন একইরকম বরাভয় মুদ্রায় অবিচল, নির্বিকল্প। জো ফ্রেজিয়ারকে নিছকই বক্সিং রিং-এর ছোট্ট পরিসরে মানতে যাওয়া ধৃষ্টামি। জীবনের বৃহত্তর ক্যানভাসেও সমান উজ্জ্বল, কোথাও বা জীবনের চেয়েও বড় প্রতিকায়িত রূপ। আর মার্কিন মুলুকে বক্সিং এক বিশেষ সম্প্রদায়ের কাছে যে জীবন বেদ, ধর্মের প্রতিরূপ! তাইতো ক্যাসিয়াস ক্লে, পরবর্তীতে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মহম্মদ আলি ‘দ্য গ্রেটেস্ট’ অভিধায় ভূষিত। মানবজাতি ও সভ্যতার ইতিহাসে আলি মানেই এক অতিমাত্রিক ও বর্ণময় সুপারম্যান, যিনি কিনা আমেরিকার উত্তর আধুনিক ইতিহাসের অভিমুখটাই বদলে দিয়েছিলেন। আর এহেন আলির সঙ্গেই তাঁর দ্বৈরথ ‘মিথ’ হয়ে আছে। ১৯৭১ এর ম্যানিলা ও ১৯৭৪-এ নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে আলি ফ্রেজিয়ার ‘বাউট’ যেন এক রূপকথার জন্ম দিয়ে গেছে, যা কালের প্রবাহে আরও উজ্জ্বল।

বস্টনের এক দীন-দরিদ্র নিগ্রো বস্তি থেকে উত্থান ‘স্মোকিন জো’র। জো ফ্রেজিয়ার-কে এই ‘স্মোকিন জো’ নামটা দিয়েছিলেন ওয়েস্টইন্ডিজের বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় ভিভিয়ান রিচার্ডস। রিচার্ডসের আদর্শ পুরুষ ছিলেন তিনি। যে বস্তিতে নিত্যদিনের রোজনামচা খুন-খারাপি, লুঠতরাজ, রাহাজানি। নিউইয়র্ক, বস্টন, ডালাস কলোনীগুলোতে আফ্রিকা, ওয়েস্টইন্ডিয়ান নেগ্রেটো সম্প্রদায়ের মানুষই সংখ্যাধিক্য। আমেরিকায় যতই আব্রাহাম লিঙ্কন থেকে মার্টিন লুথার কিং-রা সিভিল রাইট মুভমেন্টের জন্য লড়াই করে প্রাণ বিসর্জন দিন আজও সেখানে কালো মানুষের সার্বিক নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে জোলুই থেকে সাম্প্রতিক অতীতের ইভাল্ডার জোলিফিল্ডরা বক্সিং রিং-এ তার প্রতিশোধ নিয়ে গেছেন। তাঁদের অমিত বিক্রম ও বিত্ত বৈভব রিং-এর থেকে সমাজজীবনেও প্রতিফলিত হয়ে কালো মানুষদের আত্মমর্যাদা দিয়েছে। তাঁরা আজ শ্বেতাঙ্গ সমাজের পাশে স্বমহিমায় উজ্জ্বল, তাঁদের বাদ দিয়ে মার্কিন ক্রীড়া সংস্কৃতি অচল।

এই কালো মানুষদের জন্য আজীবন সরব ছিলেন জো ফ্রেজিয়ার। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত আমেরিকার নানা শহরের বস্তি অঞ্চলে কর্মরত তার ‘এনজিও’ কাজের বিস্তার নিয়ে আলোচনা, পরিকল্পনা করেছেন সহকর্মীদের সঙ্গে। দুরারোগ্য কর্কট রোগও (ক্যান্সার) তাঁর জীবনীশক্তি হরণ করতে পারেনি। ফাইটার জীবনে যেমন মুখে খই

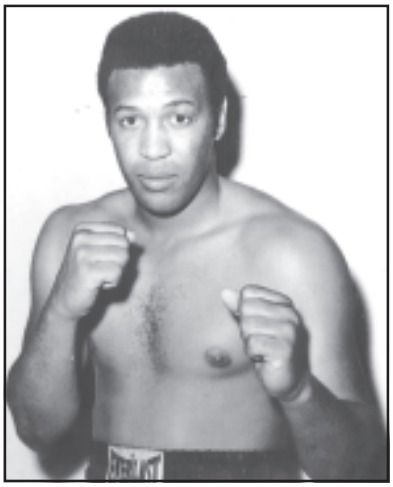

জো ফ্রেজিয়ার

ফুটতো, সমাজ ও মানবাধিকার কর্মী হিসেবেও চিন্তা ও কথকথায় ব্যতিক্রমী সত্তা হয়ে সবার মন জয় করে নিয়েছেন। আমেরিকার বহু ক্রীড়াতারকা, রকস্টার, ফিল্মস্টারের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সখ্যতা ছিল। এঁদের নিয়ে বহু চ্যারিটি শো করেছেন, যার থেকে পাওয়া অর্থ নিজের স্বেচ্ছাসেবক সংস্থায় দিয়ে জনহিতকর কাজ এগিয়ে নিয়ে গেছেন। জো ফ্রেজিয়ারের মৃত্যু তাই সবদিক থেকে কালো মানুষদের অনাথ করেছে।

পেশাদার বক্সার হিসেবে তাঁর কীর্তিকল্প বিচার করবে উত্তরকাল। ১৯৬৪-এর টোকিও অলিম্পিকে অ্যামেচার হিসেবে লাইট হেভিওয়েট বিভাগে সোনা জিতে চির প্রতিদ্বন্দ্বী আলির পদাঙ্ক অনুসরণ করে পেশাদার বক্সিংয়ে চলে আসেন। আলি অবশ্য ক্যাসিয়াস ক্লে নামে আগের রোম অলিম্পিকে সোনার পদক জিতে পরে তা হাডসন নদীতে ভাসিয়ে দেন। ফ্রেজিয়ার অবশ্য অলিম্পিক সোনার কোনও অমর্যাদা হতে দেননি। তাঁর ড্রয়িংরুমের শোকেসে অজস্র পুরস্কার, স্মারকের মধ্যমণি হয়ে বিরাজ করছে অলিম্পিক সোনা। নিজের মুখে একাধিকবার স্বীকার করেছেন পেশাদার বক্সার হিসেবে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন, বহু ধনসম্পত্তি লাভ করেছেন, এর কোনওটাই অলিম্পিক সোনার সঙ্গে তুলনীয় নয়। ফ্রেজিয়ার সব অর্থেই ছিলেন এক অনন্য চরিত্রের বক্সার।

পেশাদার জীবনে ৩৫টি লড়াই জিতেছেন, হেরেছেন চারটি। এর মধ্যে একবার করে আলি ও জর্জ ফোরম্যানের কাছে। তবে জীবনের শেষ লড়াইতে অবশ্য শ্বেতাঙ্গ চামড়ার বক্সারের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। তরুণ জর্জ অ্যাগনেস রিফ্লেক্সেই তাঁকে কাত করে দেন। তখন ফ্রেজিয়ারের বয়স ৩৪। ফ্রেজিয়ারের আপার কাট ছিল হাঙরের শাণিত কামড়ের মত। অলরিং কভার করে নিজেকে ছড়িয়ে দিতেন, মাঝে মধ্যে কাউন্টার পাঞ্চ এবং মোক্ষম সময়ে হুক ও আপার কাট মেরে প্রতিদ্বন্দ্বীকে জমি ধরিয়ে দিতেন। ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চতার ফ্রেজিয়ারের দেহসৌষ্ঠব ছিল দেখার মতো। ‘ব্ল্যাক ডেভিড’ রূপে এক শিল্পীর কল্পনায় উঠে এসেছিলেন ব্রোঞ্জ ভাস্কর্যে। অন্যান্য হেভিওয়েট বক্সারদের মতো শুধুই বিশালদেহী ছিলেন না, একই সঙ্গে অ্যাথলেটিক্স ও জিমনাস্টিকের ছন্দময় যুগলবন্দীর মাধ্যমে বক্সিংকে অন্য মাত্রা দিয়েছিল।

বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে অমর লোকগাথায় স্থান পেয়ে গেছে ফ্রেজিয়ার-মহম্মদ আলির দু’টি লড়াই। এই লড়াই ঘিরে মার্কিন জনসমাজ স্পষ্টতই দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছিল। দুনিয়ার সব খবরকে ছাপিয়ে লড়াই দুটি ‘মিডিয়ার’ কাছে প্রধান উপজীব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর সঙ্গে তুলনা টানা যায় ১৯৭২-এ আইসল্যান্ডের রাজধানী রোকিয়াভিকেতে বিশ্ব দাবার খেতাবী লড়াইয়ের। আমেরিকার ববি ফিশার ও সোভিয়েত রাশিয়ার বরিস স্প্যাসকির দাবাযুদ্ধ ঘিরে প্রকট হয়ে উঠেছিল দুই মহাশক্তিধর দেশের কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব। যা পরবর্তীতে ঠাণ্ডা যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছিল। আলি-ফ্রেজিয়ার, স্প্যাসকি-ফিশার দ্বৈরথ ঘিরে যেভাবে অন্দোলিত হয়েছিল তৎকালীন বিশ্বসমাজ, তা নিয়ে এক মহাকাব্য লিখে ফেলা যায়!

শব্দরূপ-৬০৩ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

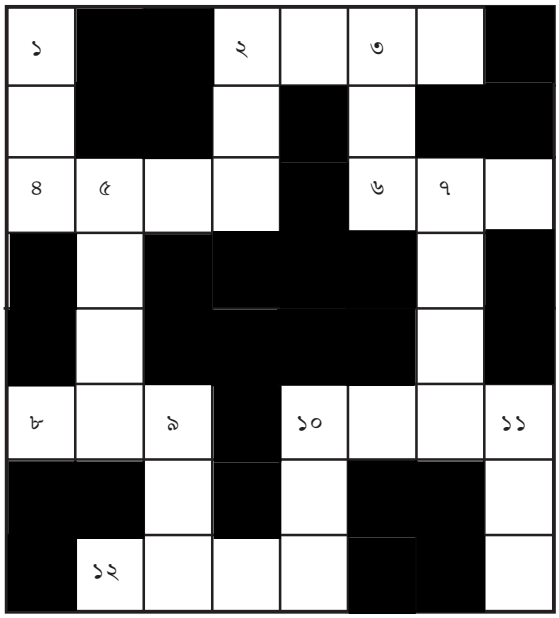

সূত্র :

পাশাপাশি : ২. ''চিত্ত যেথা—, উচ্চ যেথা শির'', **৪.** উপরি উপরি তিন রাত্রি অশৌচ পালন অথবা উপবাস করার প্রসঙ্গে গ্রাম্যভাষায় ব্যবহৃত, **৬.** কবিতার মাধুর্য; কাব্যকলা, **৮.** পরিপাক, **১০.** ঋণস্বীকারপত্র, **১২.** করতোয়া নদী।

উপর-নীচ : ১. জনক-জননীর একমাত্র বংশধর অর্থে প্রবচন, ''শিবরাত্রির—'', **২.** ঠুনকো, **৩.** সংস্কৃত 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের রচয়িতা; একে-দুয়ে চতুর্বর্ণের চতুর্থ, **৫.** বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবর্তক, স্বনামধন্য দর্শনশাস্ত্র প্রণেতা, **৭.** সূর্য, অগ্নি; শেষার্ধে অষ্ট গণদেবতা, **৯.** এক প্রকার সূক্ষ্ম পশমী শীতবস্ত্র, **১০.** তানপুরা, **১১.** চণ্ডিকা; অগ্নির সপ্তজিহ্বার এক।

সমাধান
শব্দরূপ-৬০১
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

অ	■	■	শূ	ন্য	বা	দ	■
ট	■	■	দ্র	■	স	■	■
বী	ভা	ণ্ড	ক	■	ব	জ	রা
■	জা	■	■	■	■	য়	■
■	সা	■	■	■	■	দে	■
গো	ধ	রা	■	মা	ন	ব	ক
■	■	ব	■	রু	■	■	পি
■	গ	ণ	প	তি	■	■	থ

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৬০৩ সংখ্যার সমাধান আগামী ১২ ডিসেম্বর, ২০১১ সংখ্যায়

।। চিত্রকথা।। শ্রীরামের পূর্বপুরুষ দিলীপ।। ১

মহারাজা দিলীপ ইক্ষ্বাকু বংশের মহা পরাক্রমশালী এবং প্রজাপালক শাসকদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর পত্নী সুদক্ষণার পুত্র রঘু থেকে শ্রীরামচন্দ্রের রঘুবংশের সূত্রপাত। এজন্য রামচন্দ্রকে রঘুবংশীয় বলা হয়।